SHARODIYA LIPIKA

শারদীয়া লিপিকা

OCTOBER 2019

VOLUME 13 ISSUE 1

আশ্বিন ১৪২৬

ত্রয়োদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা

EDITOR
DR. JHARNA CHATERJEE

COORDINATOR
ADITYA CHAKRAVARTI

WEB MASTER
SUBHANKAR PANDIT

COVER DESIGN
REETO GHOSH

Shila Biswas

Manitou River in Quebec (Acrylic on canvas).

সম্পাদিকার চিঠি / Letter from the Editor

প্রিয় লিপিকার পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ,

লিপিকার নৈবেদ্যের ডালি নানা রঙের ফুল দিয়ে সাজাতে পারার আনন্দ পূজোর আনন্দের সাথে মিলে আমাদের উৎসবের পরিবেশ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে এবারেও। অনেকের লেখা এসেছে। ছোটদের লেখা ও আঁকার পারদর্শিতা বিস্ময় জাগিয়েছে। গুরুগম্ভীর থেকে হালকা রসের সমণ্বয় আশা করি সবার ভাল লাগবে।

আরও অনেকের কাছে আবেদন রইল আগামী বছরের জন্য এখন থেকেই কিছু তৈরী করে রাখার, দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততার তাগিদে শেষ মুহূর্তে হয়তো সেটা হয়ে ওঠে না। আমাদের এই 'দেশান্তরীর' পরিবারটিতে এত গুণের ও প্রতিভার সমাবেশ, লিপিকার পাতায় তার একটুখানি নিদর্শন তুলে ধরতে পারলে গর্ব ও আনন্দ আরও বেশি করে অনুভব করব। লিপিকা প্রধানতঃ "ওয়েব ম্যাগাজিন" – কিন্তু আমরা প্রতি বছরেই চেষ্টা করি কিছু কাগজ-কালির কপি ছাপতে যাতে কম্পিউটারের সুবিধে যাঁদের নেই তাঁরাও এই পত্রিকা উপভোগ করতে পারেন। স্বল্প পুঁজি – তাই সব রঙিন ছবির মুদ্রণ আমাদের সাধ্যাতীত। আশা করি পাঠক-পাঠিকারা এবং লেখক-লেখিকারা এই ত্রুটী ক্ষমা করবেন। তবে শাদা-কালো ছবিও সুন্দর হতে পারে। মনে আছে কি কারও?

পূজোর অনুষ্ঠানে লিপিকার কর্মীদের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভকামনা জানাই।

ঝর্ণা চ্যাটার্জী

সম্পাদিকা, লিপিকা

Dear Lipika readers,

We are proud and happy to be able to offer another attractive edition of Lipika this year, filled with articles, stories, poems and other items from various contributors – written from a multitude of perspectives. Especially the writings and drawings from our young members are impressive, and I am sure everyone would feel proud to see them. I would like to request others to prepare something for the next year in advance, so that the demands of daily life do not obstruct their ability to contribute. We have so much talent in our community, why not showcase that in Lipika?

Although Lipika is primarily a 'web magazine', we try to print a few paper-copies every year for the convenience of those who may not have access to or do not feel comfortable with digital copies. However, with limited resources we cannot afford to print too many coloured pictures or photos. Hope the readers and contributors would forgive us for this. But Black and White pictures can be remarkably beautiful too, in an artistic photographer's hands! Remember those days?

On behalf of Lipika team, I would like to wish everyone our best wishes for Durga Puja celebration.

Jharna Chatterjee

Editor, Lipika

Note 1: Views expressed in Lipika represent the writers' views. The Lipika team is not responsible for them. Any factual inaccuracy or printing mistakes are unintentional.

Note 2: LIPIKA is a web publication and can be viewed at Deshantari webpage https://deshantari.org/publications/

****** সূচীপত্র Contents ******

DESHANTARI দেশান্তরী SHARODIYA

লিপিকা

আশ্বিন ১৪২৬ ত্রয়োদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা

October 2019 Volume 13 Issue 1

1 Manitou River in Quebec	Shila Biswas	1
2 Editorial/সম্পাদকীয়	Jharna Chatterjee/ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায়	2
3 সূচীপত্র/Contents	Lipika 2019 Team	3
4 সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথ	শ্রী সৌরেন্দ্র কুমার ব্যানার্জী	4
5 Rajasthan the Land of Kings: Ranakpur	Dr. Subhash C. Biswas	9
6 জীবন প্রবাহ এবং রবীন্দ্রনাথ	শ্রী সৌরেন্দ্র কুমার ব্যানার্জী	14
7 An Encounter of a Different Kind	Dr. Subhash C. Biswas	18
8 দুরন্ত বাধা, দিগন্ত জয়	গৌর শীল	21
9 চেনা অচেনা কথা ও ছবিতে সুন্দরবন কথা	অমর কুমার	27
10 The Supergirl and the Knight	Aheli Banerjee	34
11 Brights colors of Pujo	Vidita Mukherjee	36
12 ভালবাসা কারে কয়...	নন্দিতা ভাটনগর	37
13 পথে যেতে	ডক্টর ঝর্ণা চ্যাটার্জী	39
14 উৎসব/ Utsav	সুদীপ ঘোষ	43
15 গোল নিয়ে গোলমাল গোলাকার	আদিত্য চক্রবর্ত্তী	44
16 সেদিন (ঘূর্ণি) ঝড়ের রাতে	মদনমোহন ঘোষ	46
17 নিজের কথা	বেণু নন্দী	50
18 Bhoot Jolokia of my garden	Nirmal Kumar Sinha	51
19 One Day in Kyiv	Subha Basu Ray	52
20 তাস খেলা	সুভাষ বিশ্বাস	54
21 ইকবাল বানো এবং ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ	সুপর্ণা মজুমদার	56
22 Laugh and Live Longer	Collected from anonymous sources	60
23 Responsible Innovation	Reeto Ghosh	62
24 Somudra-Soikat	Arna Nandi	63

সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথ

শ্রী সৌরেন্দ্র কুমার ব্যানার্জী

গায়ত্রী মন্ত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন একদিকে ভূলোক, অন্তরীক্ষ, ও স্বর্গলোক, অন্যদিকে আমার ধীশক্তি, বুদ্ধি ও চেতনা , এই দুইকে যার আনন্দ যুক্ত করেছে, তিনিই আমার চিত্তের সঙ্গে প্রকৃতির শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য মিলিত করেছেন। তিনি গেয়েছেন "আনন্দলোকে, মঙ্গলালোকে বিরাজ, সত্য সুন্দর" । তিনি আরো গেয়েছেন, "এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর"।

কবি রবীন্দ্রনাথ আপন আনন্দময় সুন্দর ভাবকে, সংসারের দুঃখ কষ্টকে অতিক্রম করে, বিশ্বকে খণ্ডতার মধ্যেও মিলিত করেছেন, ভাব ও ভাষাকে আশ্রয় করে শব্দ রাশির ছন্দ দিয়ে। কাব্য বা শিল্প এক একটি সৃষ্টি। Poetry কথাটা গ্রীক মূল poiesis থকে এসেছে যার অর্থ formation বা সৃজন। শেলীর সঙ্গে সহমত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা শিল্পী ও কবির অন্তরে প্রেরণা জোগান। তিনি বলেছেন,"কর্ণধার হয়ে তিনি আমাকে অনন্ত কালের এক ঘাট থেকে অন্যত্র নিয়ে যান অনেক দুঃখ ও অশ্রুর মধ্য দিয়ে। তাঁর মনোভাব যে তিনি সেই দেবতার সুন্দর মালঞ্চের মাল্যকার হয়ে থাকবেন। বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য দেবতার আনন্দেরই প্রকাশ। ইন্দ্রিয় জগতের অধীন বলে মানুষ তাকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে পায় না। মনের চঞ্চলতাকে দমন করলেই বাস্তব জগতকে অতিক্রম করে Utopian জগত যাকে আমরা ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ বলছি সেই স্বর্গ-জগত পাওয়া যায়। অতি অল্প বয়সে লেখা কবির অনবদ্য 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'তে সেই সুন্দর বিশ্বরূপের প্রতিফলন হয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন। পরে তিনি কবি বলরাম দাসের "তোমার হিয়ার ভেতর কে কৈল বাহির" উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং বলেছেন বাস্তব জগত ও অনন্তের মধ্যে এই বিরহ বেদনা সমস্ত বিশ্বকে রচনা করেছে। বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের মতন রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন,'পতিব্রতা সতী আমি, তাইতো তোমার ঘরের সব দারিদ্র আমার সেবা করে"। সুখ এবং দুঃখের সঙ্গে সমানভাবে যে দেবতাকে রবীন্দ্রনাথ প্রাণলক্ষী ভাবে দেখেছেন, তিনিই আবার মরণেরও দেবতা। তাঁকেও বলেছেন, "মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান"। জীবন ও মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তিনি মৃত্যুর ছদ্মবেশে ভীতির সৃষ্টি করেন। কিন্তু সাধক রবীন্দ্রনাথ 'সিন্ধুপারে' কবিতাতে সেই ছদ্মবেশ ভেদ করে তাঁর মধুর হাসি দেখিয়েছেন । লিখেছেন,

"নীরবে রমণী আবৃত বদনে বসিলা শয্যা পরে,
অঙ্গুলি তুলি ইঙ্গিত করি পাশে বসাইল মোরে।
হিম হয়ে এলো সর্ব শরীর শিহরি উঠল প্রাণ-
শোণিত প্রবাহে ধ্বনিতে লাগিল ভয়ের ভীষণ তান।

ঘোমটা ভেতরে হাসিল রমণী মধুর উচ্চ হাসি
সুধীরে রমণী দুবাহু তুলিয়া, অবগুণ্ঠনখানি

উঠায়ে ধরিয়া মধুর হাসিল, মুখে না কহিয়া বাণী -

চকিত নয়নে হেরি মুখপানে পড়িয়া চরণতলে-

'এখানেও তুমি জীবন দেবতা!'কহিনু নয়নজলে।

অপরূপ তানে ব্যথা দিয়ে প্রাণে বাজিতে লাগিল বাশি।

বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি।"

কিন্তু দেবতার বিশালত্বকে খণ্ডিত ভাবে দেখলে, বাস্তব জগতের মানুষের মনে একটু দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব আসে। 'যৌবনের পত্র' কবিতাতে কবি লিখেছেন,

"পৌষের পাতা ঝরা তপোবনে

টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস

আকাশে ছড়ায়ে উচ্চ হাস

ভুলে যাওয়া যৌবন আমার

সহসা কি মনে করে

পত্র তার পাঠায়েছে মোরে

উচ্ছল বসন্তের সাথে"।

'তপোভঙ্গ' কবিতাতেও বলেছেন, দেবতা সন্ন্যাসীরও তপস্যা শূন্যে ভেসে যায় বসন্তের মাদকীয় বন্যা স্রোতে। সম্পূর্ণভাবে কবিতাটি হৃদয়ঙ্গম করলে, এই দ্বিধা দূর করে, তবু অনেকের মনে একটু থেকেই যায়। এখানে এমিলি ডিকিনসনের কথা স্মরণে রাখা উচিত," I dwell in the possibility of an immaterial dwelling, all threshold and sky beyond"। রবীন্দ্রনাথ এই সীমানা অতিক্রম করে বলতে পেরেছেন,"আমার নিগুঢতার মধ্যে বৃহত পুরাতন আসল আমি, তাঁর কৃপাতেই প্রতিফলিত হয় আমার লেখনীতে"। তিনি জীবন দেবতাকে কখনো প্রাণেশ, কখনো প্রাণেশ্বরী, কখনো প্রেয়সী, আবার কখনোবা কল্যাণময়ী রূপে দেখেছেন। তাঁর বহু লেখাতে নারী সৌন্দর্যকে জাগতিক প্রেয়সী অথবা স্বর্গের লক্ষী রূপে দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ 'সমুদ্রমন্থন' পৌরাণিক কাহিনীকে দুই ভাবে লিখলেও, মূলগত কোনও পার্থক্য দেখান নি। প্রথমটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,"সৃজনের সমুদ্রমন্থনে উঠেছিল দুই নারী - একজন উর্বশী, সুন্দরী, বিশ্বের কামনা রাজ্যের রাণী আর অন্যজন লক্ষ্মী, কল্যাণী বিশ্বের জননী, স্বর্গের ঈশ্বরী। উর্বশীতে লিখেছেন,

"আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে, মন্থিত সাগরে ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে'।

উর্বশী লেখার কিছু পূর্বে ক্যারেনু ডুরা নামক এক ফরাসী শিল্পীর অঙ্কিত এক অপূর্ব সুন্দরীর বসনহীন চিত্র দেখে তার দিব্য সৌন্দর্যের প্রকাশে মানবাত্মার সুন্দর লাবণ্য দেখেছিলেন। এই চিত্র যেন তাঁর কাছে স্ফটিকের বাতায়ন মনে হয়েছিল। Crystalএ নানান বরনের ঝিলিক থাকে,

তাতে আভাসের বিচিত্রতায় অনির্বচনীয় শিবসুন্দরের রহস্য দ্বার উদঘাটিত হয়। তৃতীয় নয়নের নিষ্কলুষ দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই শিল্পী বা কাব্যের সৌন্দর্য সম্ভোগ করা সম্ভব। উর্বশীতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"কুন্দ শুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা, তুমি অনিন্দিতা।

যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।

যুগযুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী, হে অপূর্বশোভনা উর্বশী!

মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,

তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল,

পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা"।

অখিল মানস স্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী,হে স্বপ্ন সঙ্গিনী।।"

উর্বশী নারীত্বের idealized সৌন্দর্যের প্রকাশ। উর্বশী মাতা,কন্যা বা গৃহিণী নন, তাঁর মোহিনী মূর্তি সৎসারের অতীত। দেবলোকের অমৃত পানের সখী, নর্তকী কিন্তু কল্যাণময়ী লক্ষ্মী তিনি নন। কবি আরো বলেছেন,

"জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা

ত্রিলোকর হৃদি রক্তে আঁকা তব চরণ শোণিমা

ওই শোন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী

হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশী!

ফিরিবেনা ফিরিবেনা অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,

অস্তাচল বাসিনী উর্বশী

তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ উচ্ছ্বাসে

কার চির বিরহের দীর্ঘ শ্বাস মিশে বহে আসে" ।

উর্বশী যেমন শুদ্ধ আনন্দ ও সৌন্দর্যের বন্দনা সেইরূপ 'বিজয়িনী' কবিতাটি নারীত্বের আদর্শ কল্যাণময়ী সৌন্দর্যের idealized কল্পনা। এখানেও সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি এক নারী-বক্ষের নিচোল বাস ত্যাগ করে আবক্ষ স্বচ্ছ সরসীতে স্নানে রতা । সেই সুন্দরীকে বসন্ত-সখা মদন অধীর চাঞ্চল্যে অপেক্ষা করছেন, কামনায় দগ্ধ করবেন। কবির কথায় –

"ছায়াতলে স্বপ্ন হরিণীরে ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল

বিমুগ্ধ নয়ন মৃগ বসন্ত পরশে পূর্ণ ছিল বনছায়া আলসে লালসে"

স্নানান্তে

"জল প্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ন কম্পন রাখিয়া

সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী

অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল

লাবণ্যের মায়া মন্ত্রে স্থির অচঞ্চল

বন্দী হয়ে আছে; তারি শিখরে শিখরে

পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র- ললাটে, অধরে

উড়ু'পরে কটিতটে স্তনাগ্র চূড়ায়

নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ

যেন এক ঠাই এসে আগ্রহে সন্নত

সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার" ।

তৎপরে

"ত্যজিয়া বকুল মূল, মৃদু মন্দ হাসি

উঠিল অনঙ্গদেব ।

সম্মুখেতে আসি

থমকিয়া দাঁড়ালো সহসা। মুখপানে

চাহিল নিমেষহীন ক্ষণকাল তরে ।পরক্ষণে-ভূমি পরে

জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে

নতশিরে পুষ্পধনু,পুষ্পশরভার

সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার

তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে

চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে"।।

এই কবিতাটি নারী সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা-বলা বাহুল্য। কিন্তু ইহাও Utopian জগতের।

তৃতীয় এবং এই সম্বন্ধিত আলোচ্য শেষ কবিতাটির নাম "রাত্রে ও প্রভাতে" । আদর্শ নারীর দ্বৈতরূপ, একাধারে 'কামিনী প্রেয়সী' সন্ধ্যাতে এবং প্রভাতে 'প্রেয়সী কল্যাণীর' যুগল' বর্ণনা করা হয়েছে। কবির নিজের ভাষাতে -

"কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে কুঞ্জ কাননে সুখে

ফেনিলোজ্জ্বল যৌবন সুরা ধরেছি তোমার মুখে

হেসে করিয়াছ পান-চুম্বন ভরা সরস বিম্বাধরে

তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখী, হাসি-মুকুলিত মুখে" ।

ইহা পত্নীর উর্বশী রূপ । কবি বলে চলেছেন –

"আজি নির্মল বায় শান্ত উষায় নির্জন নদী তীরে

স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা চলিয়াছ ধীরে ধীরে ।

দেবী, তব সিঁথি মূলে লেখা নব অরুণ সিন্দূর রেখা

তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয় তরুণ ইন্দুলেখা

একি মঙ্গলময় মূরতি বিকাশি প্রভাতে দিতেছ দেখা ।

আমি সম্ভ্রম ভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে "।।

এই কবিতাতে নারীর সৌন্দর্যের মধ্যে রাগরক্ত পুষ্পিত গোলাপ এবং হেমন্তের সকল শান্তির পরিপূর্ণতার অচঞ্চল লাবণ্য ভরা সুধা, একসঙ্গে প্রস্ফুটিত । এই কাব্যটিতে ভাষার গতিশীল ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে real এবং ideal এর সংহতি বা integration অপূর্ব রূপে দেখানো হয়েছে। ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ খণ্ডতার সীমা ছাড়িয়ে অনন্তের সমগ্রতা অন্যকেও হৃদয়ঙ্গম করাতে পেরেছেন ।।

'সত্যম শিবম সুন্দরম"

****

Rajasthan the Land of Kings: Ranakpur

Dr. Subhash C. Biswas

This is a concise version of an excerpt from my forthcoming book India the Land of Gods Vol 2 (*to be published).*

It is early morning in Jodhpur. The memory of the rising sun in Jaisalmer is still fresh in the mind. They all overslept last night, as there was no rush for an early hour program. Leisurely, they enjoy a sumptuous breakfast in the hotel and then get ready for the next journey. Today's program is mainly to visit Ranakpur Temple on their way to Kumbhalgarh.

The road to Kumbhalgarh begins with an excellent highway. It is the highway NH114 which is popularly known as Jodhpur-Pali Expressway. This highway is somewhat comparable to those of North America, but for one unique distinction and that is, apart from the normal traffic, there are cattle that cross the highway at ease in their usual way. And sometimes speed bumps appear suddenly causing undesirable slowdown.

After about forty minutes of driving, driver Narendra slows down the car without any apparent reason.

"Are we going to stop, Narendra? Any problem?" Godadhar asks.

"No Sir, no problem," Narendra replies with a grin. "And yes, we're going to stop for a while."

"But why? Any particular reason? I see you're laughing."

"Yes Sir, there's something funny about it. If I tell you, maybe you'll laugh too."

"Ok, then tell us."

Narendra parks the car in a suitable place on the roadside. Amazingly, there's already a good crowd gathered there. Everyone is curious about this unexpected stoppage and the gathering on the roadside. They cast an inquisitive look at Narendra and wait curiously to hear whatever he has to say. Narendra begins his story.

"People have gathered here to offer their prayer to a motor bike." Narendra grins and continues with the story. "The motor bike happens to be the deity of the shrine you see there."

"What!" Dwijobar jumps up from his seat. "People are worshipping a motor bike! Come on, you want me to believe that! I've heard and seen many weird things in this world, but worshipping a motor bike is the weirdest. It makes no sense."

"Dwijo, calm down," Godadhar tries to find some sense in this matter. "You know, Hindus worship many weird things like a piece of stone, a tree, cows, and idols made of soil or fiber glass. So what's wrong with a motor bike? And yes, Hindus even worship snakes, rats and more. There's a rat temple here in Rajasthan, you know that? Well, what's the name, wait a minute, yes, yes, it's Karni Mata Temple in Bikaner. There are twenty-five thousand holy rats there, which are worshipped every day. Do you believe it? Many tourists go there, right Narendra?"

"Yes, Sir. You're absolutely right. But this story of motor bike is really unbelievable. This shrine is called **Bullet Baba Temple**. People offer mainly beer that too of the brand called Bullet. They believe, it's no ordinary bike, it has supernatural power. ---"

"Wait, wait, wait!" Dwijobar again speaks out in a protesting tone. "Do you really mean offering beer to a bike? This is absurd, laughable, far from anything devotional! No sane person can do that, except a beer lover or a drunk."

"Listen Dwijo. I'm not much surprised here either. This is not the first or the only temple where alcoholic drinks are offered to the venerated deity. Kamalika and I visited Ujjain where we saw Kaal Bhairav Temple, also called Whiskey Dev Temple. And can you guess what's offered to the deity there?"

"No, tell me." Dwijobar is still in the mood of disbelief.

“It’s whiskey, got it? And the Prasad for devotees also contains whiskey. You can buy Puja-baskets outside the Temple, which contain a 140 ml bottle of whiskey or country liquor.”

“That’s great! I would like to be a devotee of that temple. By the way, what’s the name again?”

“Kaal Bhairav, meaning Lord Shiva.”

“Good, here it’s beer instead of whiskey. No problem, we can visit the temple.”

“But before that, let Narendra finish the story of Bullet Baba. Narendra, you may continue.”

“Yes Sir. There was a young man named Om Banna Rathore who lived in the Chotila village, not far from here. One day, it was 2nd December, 1991, not too long ago, Om Banna was driving along this road, and I mean Jodhpur-Pali Expressway. It’s believed; he was under the influence of beer and was driving at a high speed. He lost control of his bike and hit a tree on the roadside and then died instantly. His bike that fell into a ditch was impounded and taken to the police station. Next day, it was reported that the bike disappeared during the night from the Police Station and was discovered next morning in the same spot where it had been initially found. Police brought the motorbike back and this time, they emptied its fuel tank and secured it under a locked chain. To their utter surprise, they found the bike disappeared once again from the Station and found back in the same accident spot. Every attempt of the Police to retain the bike at the Station failed and the bike was always found in the same place before dawn. This episode made the local population believe, this Bullet Bike was a miracle and it possessed spiritual power. One day, a person had a vision of Om Banna. Om said, he lost his favorite bike and he was dead. But he wanted to remain there where he died. So he requested that person to do something about it. That person erected a make-shift temple with the bike in the Sanctum. Soon people started visiting the temple, tie wish-fulfilling threads on the tree and offer drinks to the idol. Thus Shree Om Banna was venerated as a deity and a well-dressed statue of him was installed in the Sanctum. Believe it or not Sir, village folks and travelers till date stop by and seek Bullet Baba’s blessings and protection. It’s said that his soul stays around the Bike and always helps people. It’s also believed, any traveler who ignores Bullet Baba is in for an unsafe journey.”

“Very interesting story,” says Dwijobar seemingly being impressed by the beer-offering aspect of the Temple. “Anyway, let’s get there and visit the one and only temple of beer loving deity.

So they get out of the car to have a glimpse of the shrine. Narendra goes inside the shrine with Puja offer. Godadhar and others have no beer to offer nor do they have a devotional wish to offer Puja. But Kamalika and Shubhra buy some sacred threads and tie them on the tree. Godadhar and Dwijobar keep on observing the crowd and their activities from outside, out of curiosity. It is amazing to see a big crowd for this little-known shrine. Not only domestic visitors, many foreign tourists are also attracted to this Bullet Baba shrine.

Narendra comes back and then they continue their journey toward Kumbhalgarh.

“Narendra, I see that you’re very knowledgeable and also have a good story-telling skill,” says Dwijobar.

“Sir, I’ve a B.A. in history and I read extensively. I’m very interested in architecture, Mythology and history of Rajasthan.”

“If you’re that qualified, why’re you working as a mere driver?”

The inherent rudeness in this remark does not escape notice of Narendra. He is taken aback, remains silent for a while and then replies very modestly with a smile, “Sir, I once had a 9 to 5 job in an office; but that didn’t suit me. I love Rajasthan, my home. I want to go everywhere again and again, with guests like you. I love every drop of water and every grain of sand of Rajasthan, Sir.”

“Oh! You’re poetic. Do you write poems?”

“Our next halt is Ranakpur, right Narendra?” Godadhar changes the course of conversation.

“Yes, Sir.”

“How far is it from here?”

“Roughly 120 km, it may take about two hours, Sir.”

“Good, now we may relax and enjoy the passing sceneries for the next two hours.”

RANAKPUR – A DREAM IN MARBLE

The car exits the highway and takes a mountainous road in the Aravalli range. The road is too narrow for the busy traffic and sometimes it is dreadfully unsafe.

“Narendra, the road is too narrow and hilly and seems dangerous. Are you comfortable enough on this kind of road?” Dwijobar asks with a cautionary tone.

“Don’t worry, Sir, I’ve driven many times on this road and I haven’t seen or heard of any accident.”

After a while, they arrive at Ranakpur. The parking lot is quite spacious and not totally occupied unlike other lots. The Temple is visible with its grandeur from the parking area.

“I vividly remember this Temple from our last visit years ago,” says Kamalika.

“Yes dear, me too, but at that time it was still under renovation,” responds Godadhar. “And do you remember how impressed we were by its architecture and sculptures and we promised to come back one day to see the beauty after renovation?”

“Yes, I do and now here we are.”

Ranakpur Temple

Nested in the Aravalli Hills, the fifteenth-century Temple appears as an exquisitely beautiful monument in marble. It is a breathtaking view that may overwhelm any visitor. Its overpowering presence defies all

description. This most intricately designed temple is called Ranakpur Temple; it is the largest temple dedicated to Adinath, the first of the twenty-four Thirthankars (enlightened sages) of the Jain religion. The campus includes a few other temples such as Parshwanath Temple, Amba Mata Temple and Surya Temple.

This Temple was built by Seth Dharna Shah, a Jain businessman, under the patronage of Rana Kumbha, the ruler of Mewar in the fifteenth century. The town of Ranakpur as well as the Temple was named after this Monarch. Seth Dharna once had a dream of seeing a celestial viman (aero vehicle). Inspired by this vision, he wanted to build a temple as an image of that vehicle. He invited many renowned artists, sculptors and architects to create an exact material shape of his dreamt vehicle. But amazingly, he was profoundly impressed by only a lesser known artist named Dipak who promised to create a temple of his vision. And thus a unique confluence of devotion, art and artistry bloomed on earth in the form of a magnificent temple that is an image of a heavenly viman. The artistic visualization along with aesthetic skill has produced a true dream in marble. The construction had begun in 1446 AD and took about fifty years of hard work and devotion to complete it in 1496 AD. The Temple, constructed totally in light coloured marble, sprawls over an area of about 48000 sq. ft. The entrance hall is adorned with a *Kichaka*, a bearded man with five bodies representing earth, water, fire, air and space.

The Adinath Shrine inside the Ranakpur Temple

On getting inside the Temple, you find yourself immersed in an ocean of beauty manifested in countless pillars adorned with intricately carved sculptures. This masterpiece is a quintessence of beauty, which emanates an aura that transports the beholder to a world of holiness. The complexity, the vast expanse and the artistic creation of this magnificent Temple are mind-blowing. One remarkable thing that comes to notice is the wonderful play of light and shade on the lofty pillars. It is widely believed that colour of these pillars changes from golden to pale blue every hour during the day.

Enshrined in the Sanctum Sanctorum is the four-faced marble image of Adinath. This is the main shrine in the complex and is called the **Chaturmukha Temple**, Chaturmukha meaning Four-faced. The four faces of Adinath signify the Thirthankar's quest for the four cardinal directions and hence the whole universe. There are twenty-nine pillared halls that lead into the various sectors such as the inner Sanctum, eighty-six shrines, five spires and twenty domes in the spacious interior of this huge complex. All these are supported

on one thousand four hundred forty four magnificent pillars each of which is exquisitely carved with floral and vegetal motifs, and amazingly no two pillars have the same design. These forty-foot tall pillars are so ingenuously positioned that the Chaturmukha Temple remains unobstructed to visitors' view from any place inside the complex. The abundantly carved domes also bear evidences of impeccable workmanship; they rise in concentric bands with richly ornamented friezes and brackets. Dancing nymphs playing flute are engraved at a height of forty-five feet and the ceilings are adorned with foliate scrollwork and geometric pattern. Huge brackets connecting the columns with the ceiling are profusely embellished with sculptures of deities.

The **Parshwanath Temple** is renowned for its engraved windows decorated with Jain figures. A single block of marble beautifully carved with one thousand and eight heads of snake and countless tails is a wonderful sight in this shrine. It is believed that no one can find the end of these tails. The star-shaped **Surya Temple** is located at close proximity. The image of Lord Surya is mounted on his chariot driven by seven horses.

This great Temple represents the five principal tenets of Jain religion, which are *Ahimsa* (Non-violence), *Satya* (Truth), *Achaurya* (Non-stealing), *Brahmacharya* (Chastity) and *Aparigraha* (Non-attachment). The principle of Ahimsa demands visitors not to bring leather products inside the Temple.

After the visit of the Ranakpur Temple, they all stand in the front yard and look back at the immense monument one more time and feel how the art and ambiance of this Temple uphold the ascetic ideology of Jainism.

"Have you noticed something here, Godai?" Dwijobar asks.

"What do you mean?"

"Unlike other religious places in India, this place has no maddening crowd. Isn't that something remarkable?"

"Remarkable indeed. As a matter of fact, that's the first thing that struck me. And the second thing is that it's a Jain temple that supposedly draws mainly Jain devotees and tourists. But I'm most awe-struck by the Temple itself. Solid slabs of marble stone rise right from the ground to support the Temple's immense exterior with flamboyant cupolas – incredible!"

"And also there's one more thing to note, Sir." Adds Narendra. "The narrow mountainous roads have been a boon in disguise. They discouraged the foreign invaders to come all the way here. Anyway, Sir, if you're done here, can we proceed toward Kumbhalgarh?"

"Surely, let's move."

***Note: Photos were taken by the author*.**

****

জীবন প্রবাহ এবং রবীন্দ্রনাথ

শ্রী সৌরেন্দ্র কুমার ব্যানার্জী

এই নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' গুচ্ছের কয়েকটি কবিতা এবং 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের দু-একটি প্রবন্ধের ভিত্তিতে, তাঁর 'গতিশীলতা' তত্ত্বের আংশিক আভাষ দেওয়া ও সম্পর্কিত আলোচনার প্রয়াস করা হয়েছে ।'যৌবনের পত্র' কবিতাতে বিগত যৌবন রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুরাতন দিনের বন্ধনহীন উচ্ছল আনন্দের জন্য বিরহী কাতরভাব অনুভব করেছিলেন । এক মধুময় দক্ষিণ বাতাস, ভুলে যাওয়া যৌবনের আবেগ মনে জাগিয়ে তাঁকে অভিভূত করেছিল । ব্যক্তিগত জীবন ও যৌবনের অবসান নিশ্চিত, কিন্তু মৃত্যু যেন ক্ষণে ক্ষণে সান্ত্বনা দেয় "পরজন্মে সেই তারুণ্য ফিরে পাওয়ার: -

"শুধু আমি যৌবন তোমার চিরদিনকার
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা হবে বারংবার
জীবনের এপার থেকে ওপার" ।

এই আশা ও বিশ্বাস তিনি 'সবুজের অভিযান' কবিতাতে প্রকাশ করেছেন । পৃথিবীর প্রগতিতে প্রাচীন ভারতের মরা গাঙে জোয়ার নিয়ে আসবে নবীন গোষ্ঠীই: -

"জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি" ।।

'ছবি' কবিতাতে গতি চঞ্চল বিশ্বের মধ্যে, প্রয়াত এক প্রিয়জনের ছবি কবিকে বারংবার দ্বিধাগ্রস্ত করেছে । এটি প্রাণহীন প্রতিকৃতি । যে প্রিয়জন একদিন উন্মুক্ত স্বাধীন উচ্ছ্বাসে প্রাণ—মন ভরিয়ে কবির জগতকে সজীব উল্লাসে ভরপুর করে রাখতো, কি করে তিনি রেখার বন্ধনে তাকে স্তব্ধ করবেন ? তাঁর প্রেম সেই ছবির মধ্যেও সজীবতার দোলন দিয়ে যায় ।

তাই অন্তরে প্রশ্ন জেগে থাকে, জীবনের পরিণাম কি চাঞ্চল্য না স্থিতি? ধরণীর ক্ষুদ্র তৃণ, ভাসমান ধূলিও সত্য, ছবিতে স্থিরতার বন্ধনে গত প্রিয়জন কি অসত্য হয়ে গেল ? কিছুদিন আগেও যে তাকে লেখনীতে প্রেরণা দিয়েছে এখনও তার স্মৃতি ও প্রেম সেই প্রেরণাই দেয়, সে নিশ্চয়ই 'নহে নহে, নও শুধু ছবি' । কবির জীবনের তরঙ্গ বেগ, এখনও তার প্রেমের উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা অনুভব করেন । কবি লিখেছেন-

"তোমায় পেয়েছি কোন্ প্রাতে
তারপরে হারিয়েছি রাতে
তারপরে অন্ধকারে গোচরে তোমারেই লভি
নও ছবি, নও নও, নও তুমি ছবি ।।

'ছবি' কবিতাতে দেখা যায়, প্রেমের আনন্দই প্রেমিককে সজীব ও প্রাণবন্ত রেখে জীবন প্রবাহে অগ্রসর করাতে পারে ।

‘শাজাহান’ কবিতাতেও এই বার্তা পুনরায় দিয়েছেন কবি। ‘ছবি’ চিত্রের মাধ্যমে ব্যক্তিগত প্রেমকে সর্ব পাঠকের সামনে ব্যক্ত করেছেন ।‘শাজাহান’ শিল্প সৌধের মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিগত প্রেমকে স্থায়ী সর্বজনীনতার রূপ দিয়েছেন । শিল্প হিসাবে তাজমহল সত্যই অপূর্ব, কিন্তু তার চাকচিক্য যেন বস্তু রূপের সাধনা। রবীন্দ্রনাথ তাজমহলকে সর্বজনীন প্রেমের সাধনার রূপে প্রাণ দিয়েছেন। শাজাহানের প্রেমপাত্রী জীবনান্তরে হলেও তাজমহল যেন অতীতের প্রেমকে স্থায়ী করে রাখতে চায়

“অতীতের চির অস্ত অন্ধকার

আজি হৃদয় তব রখিয়াছে বাঁধিয়া”

আবারও কোথাও কবি লিপিবদ্ধ করে গেছেন : -

“চলিয়াছে রাত্রের আহবানে

নক্ষত্রের গানে -

প্রভাতের সিংহদ্বার পানে” ।

জীবনের পরিপূর্ণতা সফল না হলে, পুনর্জন্মে সেই পূর্তির আশার আকুতি প্রকাশ পাচ্ছে । তিনি বুঝেছিলেন, ”একবিন্দু নয়নের জল কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল” শুকিয়ে যাবে কোনদিন। তাই তিনি বলেছেন: -

“তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ

তাই তব জীবনের রথ ফেলি যায় কীর্তিকে তোমার”

বলা-বাহুল্য যে এখানে ‘তুমি’ অর্থে তোমার প্রেমকে ইগিঁত করা হয়েছে ।

‘ছবি’ ও ‘শাজাহান’ কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:-“আমাদের এমন এক ‘এক’ নাই যাহা চির অবলম্বনীয় । প্রকৃতি ক্রমাগত ‘এক’ হইতে একান্তরে লইয়া যায় । শৈশবের ‘এক’, যৌবনের ‘এক’ ও বার্ধক্যের ‘এক’ —সব এক নয়। ইহজন্মের ‘এক’, পরজন্মের নহে। বিভিন্ন আমিত্বের মহোত্তম ও অপরিবর্তনীয় ‘একের’ দিকে আমরা যাইতেছি। ইহাই গতির পরিণাম। ক্ষুদ্র আমিত্বের সুখ দুঃখ ভুলিয়া পরম ও চরম একের প্রতি অনুরক্ত হইতে হইবে। যাঁহার অনন্ত শক্তি সবাইকে ভালবাসে, সেই প্রেমদ্বারা অসীমের দিকে ধাবমান হইতে হইবে।“

‘বলাকা’ কবিতাটিতে কবি একসময় হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত দেওদার অরণ্যের নিকট ঝিলাম নদীর তীরে আত্মমননে মগ্ন হয়ে ছিলেন। হঠাৎ আকাশে হংস বলাকার পাখার ঝাপটার আওয়াজ তাঁর অন্তরের প্রাণপাখীকে উতলা করল। দেওদারের ছায়াতে বসে অনুভব করলেন, ঝিলামের মৃদু স্রোত যেন পর্বতমণ্ডলী সহ সারা জগতকে সজীব ও চলমান রেখেছে। নিজের হৃদয়-পাখীও নিরুদ্দেশ যাত্রা করছে হংস-শ্রেণীর সাথে মুক্তির আনন্দপথে। কিন্তু কোন্ পথ, কোথায় তার শেষ? প্রকৃতির মধ্যে কি পথ নাই? কিন্তু প্রকৃতির উর্ধ্বে তো নিখিলের বাণী, “হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে?” মনে হয়, ‘চঞ্চলা’ কবিতাতে এই অন্তর দ্বন্দ্বের উপর কিছু আলোকপাত করেছেন

কবি। এই কবিতায় বিশ্ব ও জীবনকে রবীন্দ্রনাথ একটি নদীর প্রবাহের মতন দেখিয়েছেন। নদীর উৎস আছে এবং অন্তে সমুদ্র সঙ্গমের সম্ভাবনা। কিন্তু সময়ের প্রবাহ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: -

"স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে" ।

এই প্রবাহ কেবল বোঝা যায় ফেনা পুঞ্জ দেখে। অনন্ত ব্রহ্ম তাঁর প্রকাশের মধ্যে থাকেন। যুঁই, চাঁপা, বকুল, পারুল —সবইতো তাঁরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। কিন্তু তারা বারংবার ঝরে পড়ে, তাঁর ঋতুর থালি হতে। আরও বলেছেন,

"যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলি ফেলি যাও,

পথের আনন্দ বেগে অবাধে কর ক্ষয়"।

পূর্ণ বলে নিজের বলে তিনি কিছুই ধরে রাখেন না। এই উপলব্ধি হয়েছিল বলেই কি কবি রবীন্দ্রনাথ ঋষি হয়ে বলতে পেরেছিলেন,

"যুগে যুগে এসেছি ফেলিয়া চুপে চুপে

প্রাণ হতে প্রাণে নিশীথে প্রভাতে

যা কিছু পেয়েছি হাতে

এসেছে করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে

গান হতে গানে" ।।

ঈশ্বরের প্রকাশ সুন্দর ও আনন্দময়, "জীবন, মৃত্যু, পুনর্জন্মের সাগরেও" তাঁর প্রকাশ। সংসারের দুঃখ, কষ্টকে অতিক্রম করে তিনি বলেছেন:-

"সম্মুখে শান্তি পারাবার, ভাসাও তরণী হে কর্ণধার"।

'সঞ্চয়িতাতে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "নৌকার গুণ যেমন নৌকাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, যথার্থ প্রেমও জীবনকে সেইরকম বাঁধিয়া লইয়া যায়। মা কেন মনে করে, এই ছেলেটির মধ্যেই তাহার অনন্তের অবসান? অনন্তের পথে যেখানে সকল ছেলে মিলিয়া খেলা করে, 'একটি ছেলে' মায়ের হাত ধরিয়া সেই ছেলের রাজ্যে মাকে লইয়া যায়, যেখানে শতকোটি সন্তান। মনে হয় 'একটি ছেলে' বালকৃষ্ণ রূপে পরমেশ্বরকেই কল্পনা করা হয়েছে । ভগবৎ প্রেমই নৌকা হয়ে কর্ণধার ঈশ্বর দ্বারা গন্তব্য স্থানে ধাবিত হবে।

এই নিবন্ধের পরবর্তী অংশে রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত চিন্তাধারা ও 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধে তাঁর ঔপনিষদিক ভিত্তি বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। কঠ উপনিষদে (# ৭৪) বলা হইয়াছে ব্রহ্ম অসীম কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে বিবিধ রূপে তা প্রকাশিত। সৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখা জ্ঞানেরই প্রথম সোপান। 'আমি জগত হইতে বিভিন্ন' – এই ভাবনা দূর হইলে অমৃতত্ব লাভ হয়। রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই সর্বজনীন প্রেম বলেছেন। " সুখ দুঃখকে অতিক্রম করিয়া জগত এবং প্রকৃতিকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে প্রেম করিতে হইবে।" 'ছবি' ও 'শাজাহানের' ব্যক্তিগত প্রেমকে সর্বজনীন প্রেমে পরিণত করলে জীবন ও ঈশ্বরের মধ্যে সেতু হবে।

আপাতদৃষ্টিতে জীবন-মৃত্যু ও গতি—স্থিতির মধ্যে দ্বন্দ্ব মনে হয়। 'বিশ্ববোধ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। "যস্য ছায়া অমৃতং যস্য মৃত্যু"। জন্ম-মৃত্যুর সাগরে অবগাহন করিতেই হইবে। ইহা তাহারই সোপান।" 'শেষ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন নদী প্রবাহের স্থিতি সাগর সঙ্গমেই। ঈশ উপনিষদ (# ১১) অনুসারে যে চৈতন্য ক্ষুদ্র অহংকে অতক্রম করে তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। 'সুন্দর' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন এই জ্ঞানদ্বারা উপলব্ধি করা যায় যে প্রকৃতি কেবল দ্রব্য বস্তু (matter) নয় । ইহার মধ্যে অদৃশ্য বেগ আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয় এবং ছয় রিপুকে অতিক্রম করিলে অসীমকে পাওয়া যায়। উপনিষদের প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রকৃতির ঊর্ধ্বে শান্ত স্থিরতা। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, তুচ্ছ সুখ দুঃখকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিকে সুন্দর দেখিলে আনন্দময় সৌন্দর্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। 'বলাকা' কবিতাতে প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উদ্দেশহীনতা এবং চঞ্চলতাতে নদীর গতিশীলতায় নদীর গন্তব্য মহান সাগর সঙ্গম দেখিয়েছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আনন্দ প্রকৃতির প্রকাশ। প্রকৃতির ধর্ম বন্ধন, আত্মার ('বৃহত্তম আমি') মুক্তির ইচ্ছা । ঋষি-কবি প্রকৃতির কঠোর আবরণ অতিক্রম করে সীমিত প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে জ্ঞানে পরিবর্তিত করেছেন । তত্ব হিসাবে স্বতঃ বিরোধী হলেও রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই উপলব্ধি বলেছেন।

একটি মন্ত্র' প্রবন্ধের তৈত্তিরীয় উপনিষদের (# ৩০) "সত্যং জ্ঞানমন্তং ব্রহ্ম" মন্ত্রের ব্যাখ্যা নিছক প্রচলিত ব্যাখ্যাই নয়। সাধারণ ব্যাখ্যায় ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ । ব্যুৎপত্তি অর্থে সৎ ও তৎ (ত্যৎ) অর্থাৎ মূর্ত ও অমূর্ত এই দুই রুপের (বৃহদারণ্যক উপ: # ১০০) মিলনে সত্য হয়। রবীন্দ্রনাথ সত্যকে ব্রহ্মের চঞ্চল প্রকাশ দেখিয়েছেন। তাঁহার 'অসতো মা সদগময়' মন্ত্রের ব্যাখ্যা অসতের জড়তা হইতে বিকাশমান সত্যে চালিত কর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এক প্রান্তে সত্য আবার অন্য প্রান্তে ব্রহ্ম। মধ্যস্থলে হ'ল জ্ঞান। এই স্বতঃ বিরোধিতা স্বীকার করে বলেছেন ব্রহ্ম সীমা ও সীমাহীনতা উভয়েরই অতীত। ইহা উপলব্ধির বিষয়, তর্ক শাস্ত্রের নয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদের মন্ত্র সংখ্যা # ৫৯ 'আনন্দদ্যেব খলবিমানি ভূতানি জায়ন্তে', আনন্দেন জাতানি জীবনন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশনন্তীতি' রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদে পরিণত হয়েছে। তিনি ব্রহ্মকে 'আনন্দরপমমৃতং' ভাবে হৃদয়ঙ্গম করে গীতাঞ্জলীতে বলেছেন: -

"জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
ধন্য হল, ধন্য হল, মানব জীবন"

যজ্ঞ অর্থে, দুঃখ ও বিপর্যয় সহন এবং জাগতিক কামনাকে উপেক্ষা করা। করিলে 'জন্ম মৃত্যু ও পুনর্জন্মের জীবন আনন্দময় হয়। ঋষিরূপে রবীন্দ্রনাথ 'পূজাতে' গেয়েছেন :-

"যেখানে নীল মরণ লীলা উঠেছে দুলে
সেখানে মোর গানের তরী দিলাম তুলে
বাণীর চাঞ্চল্য ভবসাগরে ভাসিয়ে দিলাম"।

ঈশ্বরই কর্ণধার হয়ে স্থির-শান্তি পারাবারে নিয়ে যাবেন।

'সত্যম শিবম সুন্দরম"

An Encounter of a Different Kind

Dr. Subhash C. Biswas

(The following article has been excerpted from one of my forthcoming books and has been modified to be published as a short story. ***Every aspect of this story is true; it happened in a remote village of Bengal about seventy-five years ago****.)*

It is still summer. The long summer vacation will come to its end in a few weeks. A fair is going on at the far end of the village. Nimu has visited the fair with mother, Sarojini; but that was in the day time. He desperately wants to see the fair during the night. His friends said it was very glamorous with lots of lights.

“Ma, I want to see the fair in the night.”

“No Nimu, night or day makes no difference. It’s the same.”

“No Ma, my friends say it’s more fun in the night. Please Ma.”

“But how can you go? You’re only eight-years old; I won’t allow you going all alone.”

“Ma, Sej-da and Dhiru-da are going tonight. May I go with them?”

“If they agree to take care of you, you may.”

“Ok, Ma.”

Nimu runs to find his Sej-da. Shreesh is busy with something and does not want to entertain Nimu. Nimu is obstinate; he has to go with them at any cost. He asks repetitively and is refused every time. But Nimu does not leave hope; he makes his plan.

When Shreesh and Dhiru are about to leave the house to go to the fair, Nimu joins them. “I told you many times, you’re not coming with us,” Shreesh says in a loud voice. Nimu does not say a word. When they start going, Nimu follows them. Shreesh looks back and discovers Nimu following.

“You’re too audacious,” Shreesh rebukes him. “Go back Nimu,” he orders. “Dhiru, let’s get going.”

Nimu still follows ignoring their order. “Look Nimu, you’re ignoring my order. Now see what I do.” Shreesh draws a line across the road with a stick. “This is the no-cross line, your limit. If you cross this line, you’ll get a big slap on the face. You get it?” Nimu doesn’t say a word, only looks at them with an innocent face. They start moving again believing Nimu will obey this time. But Nimu is determined today; he crosses the line at ease and stealthily follows them.

After some distance, Dhiru notices Nimu still following them. They stop and Shreesh comes back aggressively towards Nimu.

“What did I tell you?”

“You said you’ll slap me if I crossed the line. Sej-da, give me a slap but let me go with you.”

Dhiru laughs; but Shreesh controls his laughter and scolds him once again.

“Look Nimu, this is going to be the ultimate and very serious warning.” He draws another deep line with some crisscross lines over it.

“This is Lakshman Line. You know pretty well what it means and what happens when you cross it. What happened to Sita when she crossed it?”

“She got abducted by Ravan.”

“Remember that and don’t dare cross it. Go back home.”

This time they are quite sure Nimu will be scared to trespass the Lakshman Line. The two cousins feel relieved and happily resume their course. But Nimu is unyielding; nothing can stop him today, not even the powerful Lakshman Line. Undaunted, he follows them again but at a greater distance, hiding himself from time to time. But again, Dhiru notices him.

“You wicked fellow, worse than a stinking monkey; you do deserve a slap now.” Shreesh raises his hand to slap, but Dhiru stops him.

“Shreesh-da, I think we’ve to let him come with us now. Firstly, he has proved his patience by his tenacious attempts to see the fair. And secondly and more importantly, we can’t send him back home alone; it’s quite dark now.”

Shreesh ponders for a while and then says, “Ok, come with us you mischievous fellow. But make sure you always stay close to us. I can’t keep an eye on you all the time.”

“But Sej-da, Ma knows I’ve come with you. So you can’t leave me alone, not here, not in the fair.”

“Ok, shut up and follow us.”

Thus Nimu has succeeded to come to the fair in the night. The fair looks glamorous from a distance. While in the fair, he finds it bright everywhere, many lights and more people than in the day. He moves around and gets amused and always keeps his elders in sight. He feels uncomfortable, as he has to release himself. He had this feeling before while on the way to the fair. But he couldn’t express it then, as he was more preoccupied with getting over the hurdles to accompany his brother. Now he feels embarrassed and also afraid to tell them about it. So he keeps on holding, thinking it would be better doing it on the roadside on the way back home. But when that time comes after the fair, he again feels shy and scared to ask them to stop for him. It is so dark that the road is almost invisible to him. In such darkness, even the stars can be helpful, however little. But the trees have formed a canopy overhead; so no stars are visible either. Nimu follows his elders who are moving at fast pace like two shadows oblivious of the little boy coming behind. He wonders why they don’t look back for a second to check if the little boy is still there and following, if he is alright or needs anything. His ability to hold is almost to the brink and may give in at any moment, putting him to shameful embarrassment. The thought of stopping on the roadside without telling them crosses his mind. But no, he is scared of ghosts when alone in the darkness of night. Moreover, there are a few haunted places on the way. The most horrifying of those is the mango tree near Fekshi’s house. So he keeps on walking as fast as he can. When he passes all the haunted places, he is already pretty close to the house. He finds a suitable place on the roadside and does his job. It takes some time to finish; Shreesh and Dhiru, constantly engaged in talking among them, vanish out of sight. Nimu is not afraid anymore; he is rather relaxed. Moreover, the house is visible from here. He proceeds pleasingly towards the house.

But he does not know what is waiting for him. As soon as he arrives at the main gate, he sees a gigantic white swan occupying the total entrance passage. He stops, and stands in awe and fear, wondering what that creature is and where it has come from. There are ducks in the house, but no swans. And a swan of this size is beyond his imagination. He tries to get rid of the fear and have some courage. So, as he tries to make his way into the house passing by the little space between the wall and the swan, it moves sideway to block that space. He moves back, his capacity of judgement is failing; he is bewildered. At this point, fear begins to creep back in his mind. To show that he is dauntless, he asks,

“Who are you? What do you want? Move away and let me go.” But his voice trembles.

The swan-like creature now stares straight at him and begins to move towards him in swan-like steps. Nimu is now terribly shaken; he has no doubt that it is some kind of a ghost. He instantly leaves the place and runs as fast as he can in the opposite direction, screaming at the top of his voice - `ghost, ghost!’. He crosses the road and then there is the high bamboo-fence barrier blocking the entrance of the neighboring

house. With the running momentum, he jumps over the barrier which he never could do before. He runs into the courtyard where he finds two men engaged in their nightly chat after supper. He grasps one of them with his arms still screaming - `ghost, ghost'.

The two men are two brothers – Kartik and Ganesh. They are flabbergasted seeing Nimu in their house so late at night and screaming. They find it difficult to stop him from crying. He is shaking terribly out of fear. They try hard to console him, give him courage and make him talk.

"Look Nimu, there're no ghosts in this world. They exist in stories only. Tell me exactly what you saw."

"It was a huge swan, Ganesh-dada, all white, dazzling in that darkness. And it was slowly coming towards me."

"A swan! Only a swan! Did it do anything to scare you?"

"No, it didn't pose any threat. But it was so huge, so gigantic, never have seen such a swan before."

"I think Nimu, you only imagined this creature. You must have read stories about big swans recently, right?"

"No, no, it was real, no story. I saw it."

"Then let's go there to catch your ghost."

The three go to the gate and find nothing there. Everything is as clear as ever before. Nimu suspected this – the ghost will not stay there to show itself up.

"See Nimu, there's nothing, no ghost."

"Ya, no ghost," says Kartik, "I've never seen a ghost here."

"It was just here, I'm telling the truth. It's gone now; I knew it would go away."

In the meantime, there is lot of uproar in the house. Nimu is missing. Everyone is blaming the two cousins – Shreesh and Dhiru.

"You two irresponsible, worthless fellows, you left the little boy in the fair!" Prabhas, Dhiru's father, scolds them. "In this dark night, how could you leave him?"

"No, we didn't leave him, he was following us," says Shreesh, and both look at each other with a guilty face. "Actually, we were talking on our way and forgot to look back for Nimu."

"Now you both have to come with me to go back to the fair to look for him."

Sarojini is speechless; she is on the point of breaking down. "In this darkness of the night, the boy might have gone the wrong way and got lost in the woods," she mutters.

"Me too, I'll go with you," says Barhokali, a grown-up cousin of Nimu, his most favorite.

As they begin to proceed, Kartik and Ganesh enter the house with Nimu who is still gripped with fear, and shivering and sobbing. Sarojini gets back her breath; she is consoled and relieved seeing Nimu back home. Everyone is shocked seeing Nimu's miserable condition. He is not behaving normally. Ganesh explains to them what happened. Prabhas, Barhokali, Rupali, Sarojini, Junik, all of them try to convince Nimu that there was no ghost; there cannot be any as there is none here or anywhere. People are afraid that Nimu might get possessed; so they are vehemently opposing Nimu's insistence.

"Nimu, it was actually me standing there near the gate. I was waiting for you." Dhiru tries to use a tricky way to convince him.

"No Dhiru-da, it was not you. You're not a swan."

Junik, another grown-up cousin, scolds him in a stern voice. “Enough is enough, Nimu. There’s no ghost and you’re faking it and making a drama. Now stop this nonsense and go to sleep.”

“No, no, no, I saw what I saw and I’m not making any drama. It was a swan and a huge one. It was coming to attack me.” Nimu shivers again and mumbles showing signs of getting possessed. Barhokali come forward and approaches Nimu in a hush.

“You naughty fellow, you’re making us fool eh!” He slaps him with force on both sides of the face, so that he breaks down with pain and cries. “Now stop all this fuss and forget what happened.”

Nimu cries out of pain. He looks at Barhokali, his idol for everything, his most favorite big brother, who loves him more than anyone else. He asks in his mind, “Are you really my Barho-da?” He ponders how his big brother can disbelieve him and slap him giving lot of pain. He really forgets about the ghost affair; his love for his Barho-da turns into anger. Barhokali notices the change and turns towards Sarojini.

“Kakima, he’s out of danger now. You can take him to bed. He’ll sleep with anger towards me.”

Next morning, Nimu wakes up and finds Barhokali sitting beside his bed.

“Nimu,” Barhokali addresses him very affectionately and sweetly, “here are a few *batasas*, eat. They’re very good, sweet and delicious. Yesterday night, I slapped you. I didn’t really mean to. I love you very much. Are you alright now?”

“Yes Barho-da.” Nimu sobs and sobs gazing at his big brother. He notices tears in his eyes. He takes a piece of *batasa* and puts in his mouth. The ghost has left him for good.

N.B. *The mystery of the white swan reappears in a later chapter in a more mysterious way.*

****

দুরন্ত বাধা, দিগন্ত জয়

গৌর শীল

[টেলিফোন সংলাপ]

হ্যালো বিভাসদা, অনির্বান বলছি, অনির্বান সোম ।

হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি…অনির্বান…মানে বীরবাহাদুর অনির্বান, সংক্ষেপে বীরু ।

ঠিক ধরেছেন বিভাসদা, ভালো আছেন তো আপনারা এখন? আপনার ডানপায়ের হাঁটুতে সার্জারি হয়েছিল জানি, আশাকরি তার recovery complete ।

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এখন হাঁটাচলা স্বাভাবিক হয়ে গেছে, রোজ সকালে দু-তিন কিলোমিটার হাঁটলেও কোনও অসুবিধা নেই… Touch wood ! তা বীরবাহাদুর, তোমার খবর কী? কাজকর্ম কেমন চলছে?

আপনাদের সকলের শুভেচ্ছায় চলছে একরকম ভালই । আর ওপরওয়ালার আশীর্বাদে শারীরিক মানসিক দুদিকই under control বলা যায় । তবুও Acid-reflux-এর কবলে পড়ে ওষুধ খেতে হয় মাঝে মধ্যে ।

তোমার বৌদিরও ঐ একই Situation । Heartburn-এর জন্য তৈরী হয়েই থাকে সে Zantac Gaviscon সঙ্গে নিয়ে । তবে রোজ রোজ ওষুধ খেতে হয় না…God forbid ! যাকগে, এবার Summer-এ তোমাদের Vacation Plan করেছ ? এদিকে একবার ঘুরে যেতে পারো তো। এই Iceland দেশটা ভ্রমণের পক্ষে Ideal – যদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তোমার কাছে উপভোগ করার Item হয় ।

ওঃ বিভাসদা, আপনার আন্দাজ পাখীর চোখে অর্জুনের তীরের মতো বিঁধে গেছে। আমরা Plan করেছি Scandinavia-র দেশগুলো দেখে আসতে। Norway থেকে Denmark ।

কিভাবে Cover করছো দেশগুলো ?

Mostly by Train…Eurailpass টিকিটে। তবে সুইডেনের Stockholm থেকে ফিনল্যান্ডের Helsinki ট্রেনে বড়ো ঘুরপথ হয় – তাই ওটা হয় বাদ দিতে হবে অথবা Plane-এ যাতায়াত করতে হবে । একটু দোটানায় পড়েছি এখানে। আপনি কি বলেন?

ট্রেন ও প্লেন ছাড়া ঐ দুই শহরে জলপথেও যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত আছে। একটা Cruise ship ঐ পথে Regular আসা-যাওয়া করে Overnight। অর্থাৎ সারারাত ঘুমিয়ে সকালে শহরে নামো – সারাদিন শহর পরিক্রমা করে দিনের শেষে জাহাজে ফিরে বিশ্রাম, এবং পরের দিন সকালে Stockholm-এ প্রত্যাবর্তন । এটা ভেবে দেখতে পারো । দু'রাতের হোটেল খরচ ধরে হিসেব করলে Expensive মনে হবে না। এটাই আমার Suggestion।

Excellent Suggestion বিভাসদা। আমাদের Itinerary-র সঙ্গে এটা মানিয়ে যাবে অনায়াসে। অসংখ্য ধন্যবাদ।

কিন্তু বীরুভাই, এই পরামর্শটুকু নেওয়ার জন্যে তো তুমি নিশ্চয় আমাকে ফোন করোনি। এবার তাহলে বলো তোমার মনের গোপন বার্তাটি ।

একটু Backtrack করে বলি। আমরা Toronto থেকে Oslo অবধি Icelandair-যে টিকিট কেটেছি তাতে তিনদিন পর্যন্ত Iceland-এ stop করা যাবে, Extra কোনও চার্জ লাগবে না। আপনি কি শুনেছেন এই Stopover Program-টার কথা?

আমি শুনেছি কি শুনিনি তাতে কিছু এসে যায় না, তোমরা শুনলেই যথেষ্ট। সুস্মিতাকে নিয়ে টরোন্টো থেকে সোজা Iceland-এ চলে এসো। আমার এখানেই থাকবে তোমরা তিনদিন। জমাটি আড্ডা হবে। এখানকার Fresh Cod মাছের ফ্রাই খাওয়াবো অঢেল। তারপর নাহয় নরওয়ের রাজার বাড়ি দেখতে যেও।

অত লোভ দেখাবেন না। প্রথমতঃ Flight schedule-এর সঙ্গে Stopover-এর তাল মেলাতে গেলে আড়াই দিনের বেশী ম্যানেজ করা যাবে না। সেই সময়টা আপনার অতিথি হয়ে খেয়ে দেয়ে কলকলিয়ে অতি চমৎকার কাটবে বটে, কিন্তু দর্শনীয় বস্তুর কাছাকাছি হোটেলে না থাকলে তারা নাগালের বাইরে থেকে যাবে না?

তুমি তো মহা ঘুঘু। শুধু ফাঁকতালে উপদেশটুকু নিয়ে কেটে পড়ার তাল।

আপনাদের সঙ্গে দেখা তো হবেই। নিশ্চিন্ত থাকুন – আমরা যাবোই আপনার VIP Residence- গিয়ে Fish Fry-এর সদ্ব্যবহার করতে। ভালো থাকবেন।

[Thingvellir National Park, Iceland থেকে]

বিভাসদা, অনির্বান বলছি, কেমন আছেন বলুন।

কে, বীরু? একটু আগেই ভাবছিলাম তোমাদের কথা। এসে গেছো ? কিন্ত এত দেরী হল কেন ফোন করতে ? প্লেন তো অনেক আগেই এসে পৌছানোর কথা।

প্লেন ঠিক সময়মতোই এসেছে বিভাসদা। সকাল নটায়।

সে তো চার ঘন্টা আগের কথা। তুমি কি এখন তোমার হোটেল থেকে কথা বলছো?

না, হোটেল থেকে নয়। আমরা এয়ারপোর্ট থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়েছি। তবে Reykjavik শহরে না গিয়ে আমরা ঢুকেছি Golden Circle Route-এ। এই রুটে তিনটে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ রয়েছে ট্রাভেল গাইডে লিখেছে । তার মধ্যে দুটো আমরা ঘুরে দেখেছি এখন পর্যন্ত।

কোন দুটো?

ঐ যে Gullfoss waterfalls আর Geysir Geothermal Area। দুটোই ভালোভাবে দেখা হয়েছে বলা যায়। বিশেষ করে মাটি ফুঁড়ে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা Geysir বা গরম জলের ফোয়ারাটি বেশ নাটকীয় পরিবেশ তৈরী করেছিল। সেই তুলনায় আজকের এই মেঘলা আকাশ আর ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে Gullfoss-এর উজ্বল উতরোল জলোচ্ছ্বাস অনেকটাই ম্লান। Rainbow-টেনবো দেখার কোনও চান্স নেই, বৃষ্টির জল জলপ্রপাতের ফেনার সঙ্গে যেন হাত মিলিয়েছে গা-মাথা ভিজিয়ে দিতে।

ঠিকই. আজকের Damp Weather তেমন সুবিধের নয় Excursion এর পক্ষে। প্রকৃতিদেবী সদয় নন তোমাদের প্রতি - কি আর করা যাবে।

বিভাসদা, আমাদের গায়ে হাল্কা রেন-কোট আছে, সুতরাং জলের ছাট্ সামলাতে পারি। কিন্তু এখন আমরা এসে পৌঁছেছি যেখানে তার নাম Thingvellir National Park। এর খুব নামডাক আছে। আমার হাতের চটি বইতে লিখেছে এটা একটা UNESCO World Heritage Site। কিন্তু এখানে যে কোথায় কি দেখবো সেটা নিয়ে একটু ধন্ধ লাগছে।

আমি এখনও ঐ Park-টায় বেড়াতে যাইনি। "একদিন গেলেই হবে, রয়েছে তো হাতের কাছেই" এই রকম ভাবলে যা হয় আর কী । যেমন, কলকাতায় থেকেও অনেকে কখনও Birla Planetarium-এ যায়নি। যাই হোক, তোমার ঐ চটি বইতে কোনও তথ্য নেই এই Park প্রসঙ্গে ?

আছে কিছু কথা যা বেশ কৌতুহল জাগায় সন্দেহ নেই। যেমন " ... a place where Iceland's stark geological processes are playing right in front of you…" অথবা "Where you walk between two continents", এই ধরণের বিজ্ঞপ্তি ।

ঐ সব চটক লাগানো কথা কৌতুহলে সুড়সুড়ি দেবার জন্যেই। আসলে আইসল্যান্ড দুটো Continental Tectonic Plate-এর Junction-এ বসে আছে। আর এই Plate দুটো অতি ধীরে সরে যাচ্ছে আলাদা হয়ে। তাই ঠিক জায়গায় দাঁড়ালে Technically দুই Continent-এ দু পা রেখে হাঁটা সম্ভব। সেই জায়গাটা তোমাদের খুঁজে পেতে হবে আগে। তবে তোমরা একটা চান্স নিতে পারো। আচ্ছা, ওখানে কোনো Tour Group দেখতে পাচ্ছো ?

নাঃ বিভাসদা, কোনো Group দেখছি না আশেপাশে। তবে অনেক লোক রয়েছে কাছাকাছি। আমরা একটা বড়ো Parking Lot-এর মতো জায়গায় একটা কালভার্টের ওপরে দাঁড়িয়ে আছি। এর তলা দিয়ে একটা নালা বয়ে যাচ্ছে। একটু দূরে একটা Office Building দেখা যাচ্ছে, তার মাথায় একটা Flag উড়ছে। মনে হচ্ছে একটা Visitor Center। তাহলে ওখানে গিয়ে খোঁজ নেওয়া যেতে পারে।

এগিয়ে যাও তাহলে । সন্ধেবেলায় দেখা হবে মনে রেখো । গুড লাক।

[অনির্বানের ডায়েরী থেকে]

কানাডার টরন্টো হাওয়াই আড্ডা থেকে আইসল্যান্ডের Reykjavik প্রায় সওয়া পাঁচ ঘন্টার উড়ান। Icelandair-এর বিমানটি পাড়ি দিয়েছিলো প্রায় মাঝরাতে, আইসল্যান্ডে নামলো স্থানীয় সময় সাড়ে নটা নাগাদ। আমাদের মালপত্র সঙ্গেই ছিল, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে Immigration পার হয়ে Arrival Hall-এ পৌঁছে গেলাম। একটা গাড়ি আগে ভাগেই ঠিক করা ছিল Ace Car Rental থেকে, কিন্তু তাদের অফিস এয়ারপোর্টের বাইরে – তাই আমাদের অপেক্ষা করতে হোল তাদের Shuttle ধরবার জন্যে। মিনিট পনের পরে সেই Shuttle-টি এলো ফিরে যাবার যাত্রীদের

নিয়ে। তারা নেমে গেল প্লেন ধরতে, তারপর আমরা এবং আরো তিনজন Shuttle Van-এ উঠলাম। মিনিট দশেক পরে Ace Car Rental-এর অফিসে পৌঁছানো গেল। কাউন্টার খালি ছিল না, অতএব আরো দশ-বারো মিনিটের অপেক্ষা। তারপর গাড়ি পাওয়া গেল বেশ সহজেই। AC, Automatic, unlimited mileage নিয়ে একটা সাধারণ compact গাড়ি, ভাড়া কানাডার তিনগুন । Welcome to Iceland !

এয়ারপোর্ট থেকে Reykjavik শহর প্রায় পঞ্চাশ কি.মি.—আমাদের হোটেলও তাই। কিন্তু বিকেল চারটের আগে সেখানে দরজা খুলবে না, তাই ঠিক করাই ছিলো প্রথমেই Golden Circle route ঘুরে আসা যাবে। এই বৃত্তাকার পথে তিনটি বিশেষ দর্শনীয় বস্তু রয়েছে: Gullfoss জলপ্রপাত, Geysir উষ্ণজলের কুণ্ড ও ফোয়ারা আর World Heritage-এর তকমা পাওয়া Thingvellir National Park। আমরা প্রথম দুটো নির্বিঘ্নে দেখে নিলাম। স্মার্টফোনে GPS ছিলো, কোথাও রাস্তা হারাইনি । মুস্কিল হোল Thingvellir পার্কে এসে।

এখানে দেখার জিনিসগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এদিকে Weather ভাল না হওয়ায় বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রকোপে দেখার উৎসাহ ক্রমশঃ নিভে আসছিলো। এই সময়েই বিভাসদার সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিলো (উপরোক্ত)

বিভাসদার সঙ্গে কথা বলার পরে আমরা Visitor Centre-এর দিকে যাচ্ছিলাম।

তখন একজন Park Ranger-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার কাছে জানা গেল যে Visitor Center থেকে কয়েকটা Pathway চলে গেছে বিভিন্ন Fissures ও rift valley-র দিকে। তাদের মধ্যে একটা ধরে হাঁটতে হবে Continental shift দেখতে গেলে।

আমরা Visitor Center-এর পেছনে গিয়ে একটা হাঁটাপথ ধরলাম। প্রায় এক কিলোমিটার যাবার পর কাঠের পাটাতন পাতা একটা Walkway পাওয়া গেল। আরো কিছু পরে একটা রেলিঙ দিয়ে ঘেরা জায়গা পাওয়া গেল – কিছু লোক সেখানে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে কিছু দেখছে। আমরাও ঐ রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে তাকালাম নীচে। প্রায় তিরিশ ফুট নীচে অসমতল পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে একটা আঁকাবাঁকা ফাটল দেখা যাচ্ছিলো। কমবেশি হাত দুয়েক চওড়া। প্রায় পঞ্চাশ মিটার পরে বাঁদিকে বেঁকে ফাটলটা অদৃশ্য। এই তাহলে দুই Tectonic Plates এর বিভাজন? যা এক থেকে দেড় সেন্টিমিটার করে সরে যাচ্ছে একে অন্যের থেকে? ভূবিদ্যা ও বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর তীর্থস্থান কিন্তু তেমন সাড়া জাগালো না আমার মনে । আরও বিভিন্ন Viewpoint থেকে Continental shift-এর অন্যতর চেহারা দেখার সুযোগ থাকলেও কয়েকটা ছবি তুলে আমরা তখনই বেরিয়ে এলাম Thingvellir থেকে। ইতিমধ্যে বেলা চারটে বেজে গেছে। এবার যাত্রা হোটেলের দিকে।

হোটেল বলতে যেখানে আমরা উঠেছিলাম সেটা একটা Boarding Lodge। দোতলা, গোটা ছয়েক ঘর, একটা Kitchen। পরিচ্ছন্ন Attached bathroom। আমরা Coffee আর Snacks নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলাম । তারপর তৈরী হওয়া গেল বিভাসদার ডিপ্লোম্যাটিক আবাসনে হাজির হতে । Reykjavik শহরের উপকণ্ঠে, কেন্দ্র থেকে বেশ কাছেই।

অচেনা শহর, পথে ভরসা GPS-এর Direction। Reykjavik খুব বড়ো শহর নয়, আধঘন্টার মধ্যে বিভাসদার ঠিকানায় পৌঁছান গেল। রাস্তা হারাইনি শুনে বাহবা দিলেন, আমি সবিনয়ে জানালাম GPS-এর ভরসাতেই পথে নেমেছি। বৌদি মৃদু অনুযোগ করলেন ওঁদের আতিথ্য না নিয়ে কেন আমরা হোটেলে উঠেছি – বলে-কয়ে ওঁকে শান্ত করা গেল। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে আড্ডা। বিভাসদার প্রশ্নের উত্তরে জানালাম যে Continental shift দেখে আমি তেমন Impressed হইনি, যতটা হয়েছি Gulfoss আর Geysir দেখে। তখন বিভাসদা বোঝালেন যে গতিমান বস্তুরা যত সহজে আমাদের অভিভূত করতে পারে, স্থবির বস্তুরা ততটা পারে না। বিশেষতঃ আমরা এক্ষেত্রে একটা অতি ক্ষুদ্র অংশই দেখতে পাই,তাতে না আছে আগুন, না আছে গর্জন – এ তো এভারেষ্ট বা তাজমহল নয় ! তুমি যদি Equador-এর রাজধানী Quito-তে যাও, সেখানে দু পা দুই Hemisphere-এ রেখে দাঁড়াতে পারবে, কিন্তু কোন Thrill আশা কোরো না, যদি না হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হয়।

বিভাসদা ও স্বাগতাবৌদির কাছে বিদায় নিয়ে যখন আমরা বের হলাম তখন রাত এগারোটা বাজলেও অন্ধকার তেমন গাঢ় নয়। এখানে দিন এখন খুবই বড়ো এবং তারপরেও দূর-দিগন্তে আলোর রেশ থাকে অনেকক্ষণ। আমরা হোটেলে ফিরে এলাম নির্বিঘ্নে এবং পরের দিনের প্রোগ্রামটা ছকে নিয়ে একটু পরেই শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলো সকাল সাতটায়। আমরা স্নান-টান সেরে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যেতে হবে শহরের শেষে Old Port এলাকায়। সেখান থেকে শুরু হবে Puffin Boat Trip । একটা ছোট জাহাজে উঠে একটা দ্বীপে Puffin পাখীদের ডেরার চারধার পরিক্রমা ।

Old Port এলাকায় পৌঁছালাম সকাল নটা নাগাদ। বোট ছাড়বে এক ঘন্টা বাদে। আমরা গাড়ি পার্ক করে Breakfast সারতে কাছেই একটা Dockside Coffee-shop-এ ঢুকলাম। ধীরেসুস্থে জলখাবার শেষ করে আমরা ডকের ধার দিয়ে হেঁটে বোটে উঠলাম। দশটায় বোট ছাড়লো। দিনটা ছিল ঝকঝকে, আকাশ ঘন নীল, বাতাসে সুর্যদেবের উষ্ণ স্পর্শ। আমাদের বোট পনের মিনিট চলার পর একটা ছোট দ্বীপ দেখা গেল, তার ওপরে উরন্ত পাখীরা ঘুরছিল। বোট ক্রমশঃ দ্বীপের কাছে গিয়ে Motor থামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, যাত্রীরা ক্যামেরায় ছবি তোলার সুযোগ পেয়ে খুশি। পাফিন পাখীরা দল বেঁধে বসে আছে দ্বীপের মাটিতে, অনেকে উড়ছে আকাশে, কিছু কিছু জলের ওপরেও বসে আছে স্বচ্ছন্দে। প্রায় সকলেই ক্যামেরা কিংবা স্মার্টফোনে ছবি ও Selfie তোলায় ব্যস্ত। আমাদের বোট ধীরগতিতে দ্বীপের চারপাশে ঘুরে এলো তারপর ফেরার পালা ।প্রায় বেলা বারটা নাগাদ ফিরেএলাম বন্দরে জাহাজঘাটে।

এরপর আমরা শহরের মধ্যে কয়েকটা বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু ও স্থান দেখতে এগোলাম। Sun Voyager নামে ভ্রমণতরীর নক্সায় তৈরী একটা ষ্টেনলেশ ষ্টীলের Structure দাঁড়িয়ে আছে জলের কিনারায়, সেটা দেখলাম । একটা আধুনিক ক্যাথিড্রাল Hallgrimskirja, Iceland-এর উচ্চতম চার্চ (75 মিঃ), এর অতি আকর্ষণীয় স্থাপত্যে রয়েছে Iceland-এর প্রাকৃতিক বৈচিত্রের ছাপ। চার্চের ভেতরেও শান্ত পরিবেশে কিছুটা সময় কাটলো।

হাঁটতে হাঁটতে সামনে একটা Noodle Station দেখে আমরা সেখানে ঢুকলাম লাঞ্চ সারতে। এখানকার Asian Soup ভিয়েতনাম রেস্তোরার Pho-এর মতো। পরিমাণে অনেকটাই ছিলো, কিছুটা Leftover আমরা সঙ্গে নিয়ে নিলাম।

তারপর ওখান থেকে গাড়িতে Austurvollur Public Square-এ গেলাম। গাড়িটা রেখে Square-এ খানিকক্ষণ হাঁটবার পর একটা বেঞ্চে বসে একটু বিশ্রাম নেওয়া গেল। রোদের তেজ তখন বেশ কড়া। আমরা গেলাম Reykjavik City Hall-এর ভেতরে। প্রায় একঘন্টা পরে সেখান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম আমরা। এরপর Harpa Concert Hall আর দর্শনীয় Perlan Glass-domed Building দুটো বাইরে থেকে দেখে ফিরে এলাম হোটেলে। দীর্ঘস্থায়ী দিনের খানিকটা তখনও বাকী থাকলেও আমরা আর বেরোইনি, শুধু একবার কাছাকাছি KFC থেকে কিছু খাদ্য-পানীয় কিনে আনা ছাড়া । পরের দিন সকাল দশটায় Oslo-র বিমান ধরতে হবে। তার আগে দেখে নিতে হবে বিখ্যাত Blue Lagoon।

পরের দিন সকালে তাড়াতাড়িই উঠেছিলাম। সকাল সাতটায় সুটকেস গুছিয়ে আমরা তৈরী। আমরা এয়ারপোর্টের দিকে তিরিশ কি. মি. যাবার পর রাস্তা বেঁকে গেল Blue Lagoon-এর দিকে। GPS-এর Direction ধরে সেখানে পৌঁছে গেলাম সহজেই। তখনও দরজা খুলতে কয়েক মিনিট বাকী – কিছু স্নানার্থী ইতিমধ্যেই জড় হয়েছে। আমাদের অবশ্য লেগুনে নাবার কোন প্রস্তুতি নেই – শুধু চোখের দেখা। যাই হোক, দরজা খুললে আমরা ভেতরে কাফেতে গিয়ে কফি-ক্রোয়াসা নিয়ে বসে গেলাম। Blue Lagoon-এর জলের রঙ নীল-সবুজে মেশা এবং ধোঁয়া-ওঠা গরম। অনেকে জলে নেমেছে ইতিমধ্যে। আমরা কফি শেষ করে উঠে পড়লাম। এখান থেকে এয়ারপোর্ট কুড়ি কি.মি. । আমরা আগে গাড়ীটা ফেরত দেব, তারপর ওদের Shuttle চেপে এয়ারপোর্ট।

GPS-এ ACE Car Rental-এর ঠিকানা লাগিয়ে আমরা রওনা দিলাম। গাড়ি এয়ারপোর্টের কাছাকাছি চলে এলো। তারপর কয়েকটা রাস্তা ঘুরে এমন একজায়গায় এলো যে সেটা একটা Dead End। অগত্যা গাড়ি থেকে নেমে একটা দোকানে নেমে ঠিকানাটা দেখিয়ে Direction চাইতে সে বললো কোন দিকে যেতে হবে। সেইমতো গিয়ে দেখা গেল সেটা একটা অন্য কোম্পানী। এদিকে সময় এগিয়ে আসছে এয়ারপোর্টে হাজির হওয়ার। অবস্থা গুরুতর হচ্ছে ক্রমশ। পাশেই রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে দুজন ছেলে বসেছিল। তারা লোকাল শুনে অনুরোধ করলাম যদি আমাদের এই ঠিকানায় পৌঁছে দিতে পারে সে তখুনি তার বন্ধুকে বলে নেমে এল। তারপর সামনের Car Rental অফিসে খোঁজ করে এসে জানাল মিনিট সাতেক লাগবে। তারপর চালকের আসনে বসে গাড়ি স্টার্ট দিলো ।

এমন সময় মোবাইল বেজে উঠলো। বিভাসদার ফোন।

বিঃ কী খবর বীরু, এয়ারপোর্টে গিয়েছো ।

অঃ এখনো যেতে পারিনি । একটু মুস্কিল হয়েছে। Ace Car Rental-এর Off-Airport Counter-টা খুঁজে পাচ্ছি না শেষে একজন লোকাল ছেলেকে গাড়িতে তুলেছি হেল্প করতে। সে-ই গাড়ি চালাচ্ছে ।

বিঃ মনে হয় শীঘ্রই পেয়ে যাবে। আর নেহাৎ না পেলে Airport-এর Budget-এ গাড়ি আর চাবিটা রেখে আমাকে ফোন করে জানিয়ে দিও। ব্যবস্থা হয়ে যাবে । Don't Worry।

অঃ নিশ্চয়ই করবো। বাঁচালেন। ওঃ বিভাসদা, এদিকে সুস্মিতা কিছু একটা লক্ষ্য করেছে। আরে, ঐ তো ACE লেখা দেখছি ডানদিকের বিল্ডিঙে। আমাদের পরিত্রাতা ছেলেটি গাড়ি ঘোরাচ্ছে। এসে গেছি !

বিঃ All's well that ends well ! Have a good flight to Oslo!

অঃ ভালো থাকবেন আপনারা। বৌদিকে আমাদের নমস্কার জানাবেন।

Hallgrimskirja Cathedral

****

চেনা অচেনা কথা ও ছবিতে সুন্দরবন

কথা - অমর কুমার ও অন্যান্য উদ্ধৃতি ছবি –সুবীর কুমার

"আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার'
উষা কাহার আশিস
বহি হল আঁধার পার"

জাগো ----------
নতুন প্রভাত জাগো সময় হোল
জাগো নব-দিনমণি অন্ধ তিমিরও দ্বার
খোলো হে খোলো

জাগো জাগো সুন্দর
তোমার পরশে সব রাঙিয়ে তোলো
নতুন প্রভাত, জাগো সময় হোল

প্রতীক্ষায় কেটে গেল এ জীবন
সারা

“আর কত কাল আমি রব
দিশাহারা“-

সাথী-হারা এক বলাকা,

দুচোখে স্বপ্ন আঁকা

কি দারুণ একাগ্রতায়

কিসের অন্বেষণে তুমি স্থবির, একা

আমরা ভাঙ্গি দল
আমরা গড়ি,
মুক্তির আনন্দতে চড়ে
বেড়াই
সারাটা দিন,
আমরা স্বাধীন

বনে বনে ফুল ফোটে
তোমারই মায়ায়
গন্ধে বর্ণে সুরভিতে
বন্দনা গায়

ফুলে ফুলে মধু ভরা

মৌমাছিদের সদাই ত্বরা

ঝিলমিল নীল প্রজাপতিরা

সৃষ্টিতে তোমার মুখর ওরা

"বনে বনে ফুল ফুটেছে," দোলে
নবীন সবুজ পাতা

পূজার ঘন্টা উঠলো বেজে হবে
তোমার মালা গাঁথা

গাঁয়ের ঘাটের পাশে, নৌকো বাঁধা আছে

বৈঠা বেয়ে তুমি আমি চলো ভেসে যাই অসীমের কাছে

সুন্দর বনে সুন্দরী গাছ

ঝিলমিল রোদ যেন আয়নার কাঁচ

রাততির নামলেই ভূতেদের নাচ

শিল্পী মনের কল্পনা

যেন রং তুলি দিয়ে আঁকা ছবিখানা

"ওগো কাজল নয়না"

চকিত চপলা হরিণী---

কি অপার বিস্ময়ে মেলে দাও
মায়া ভরা দুটি আঁখি

অলস কুমীর রোদ পোহায়

কুমীর হিংস্র খিধের জ্বালায়

জ্যান্ত জীব গোটাই গিলে খায়

শিশুরা নিষ্পাপ মাতৃক্রোড়ে
সুন্দরবনে বন্যেরা সুন্দর
বিস্তীর্ণ উদ্যমতায় ঘোরে
বাঘ হরিণ হাতি কুমীর বাঁদর

0

“ও নদীরে ----------

তুমি এই আছো ভাঁটায় আবার
এইতো দেখি জোয়ারে

সুখ দুঃখের কথা কিছু কইলে নাহয়
আমারে “

“দেখোরে . . দেখোরে

জগতের কি বাহার”

দিনের আলোয়, নাইকো
অন্ধকার

আহা মরি - লাগে চমৎকার

“সুজন মাঝিরে----------

কোন ঘাটে লাগাইবা তোমার নাও

আমি পাড়ের আশায় বইসা আছি

আমায় লইয়া যাও”

মৌচাকে জমেছে কত মধু ,
প্রকৃতির নিঃশর্ত দানে নিঃশব্দে
নীরবে
ঘটে যায় যে কত কিছু --
সবার অগোচরে
এ বিশ্ব চরাচরে

“একূল ভেঙ্গে ওকূল তুমি গড়ো
যার একূল ওকূল দুকূল গেল
তার লাগি কি করো----------“

কৃষ্ণকলি আমি ওদের বলি
বলে যা বলুক সোঁদরবনের লোক
কনে দেখা বিকেলেতে
দেখেছি ওদের মিষ্টি মুখের হাসি আর
লজ্জা ভেজা চোখ

The Supergirl and the Knight

Aheli Banerjee, 8 years

Once upon a time, there was a knight and a Supergirl.

The Knight was really a prince but disguised as a knight. He was disguised because he wanted to save the kingdom from the dragons. If the knight did not help, the kingdom would be burnt! The Supergirl was really a princess, but disguised as a Supergirl because she also wanted to save people. If both didn't not help the kingdom, it would be a mess.

One day, the princess and the prince were at school. Suddenly, a huge cloud appeared on top of the school! The dragons were blowing out fire and the smoke was the huge cloud. The Supergiril and Knight saw the huge cloud from their classroom and they knew the dragons were coming and going to burn the kingdom.

The dragons were almost there at the kingdom. Did the people know that there were dragons in the kingdom? No, they did not.

The Supergirl and the Knight, rode in their flying wagon to the clouds to fight with the dragons. They were fighting very hard. In the fight, one of the dragons took the Supergirl and threw her onto a cloud, but the Supergirl was strong, so she did survive. Then the Supergirl fired a fire bullet on the dragon's eye. The Knight grabbed his sword and cut the dragon's neck. So, the dragons were dead and the kingdom was saved.

Everybody lived happily ever after.

Bright colors of Pujo

Vidita Mukherjee, 8 years

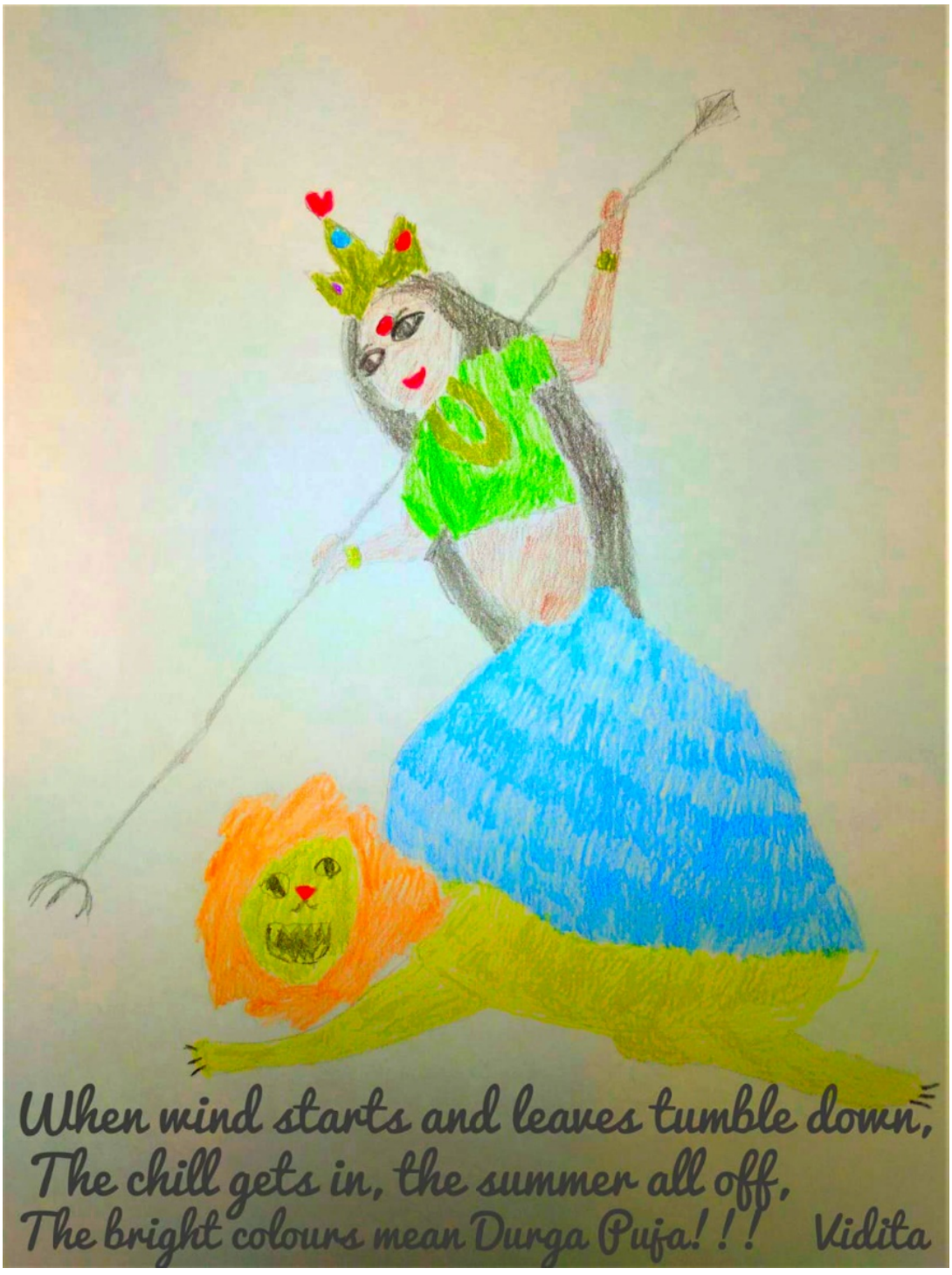

ভালবাসা কারে কয়...

নন্দিতা ভাটনগর

এর পরে রবীন্দ্রনাথই প্রশণ করেছেন – "সেকি কেবলই যাতনাময়?" কথাটা ব্যক্তি বিশেষে বিচার্য্য; নিক্তির ওজনে এর পরিমাপ হয় না। আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনায় ভগবৎ প্রেম থেকে মানবিক প্রেম – সবই পড়ে ভালবাসার broad spectrum এর আওতায়।

আমার অল্প বয়সটাতে 'প্রেম' কথাটা বানান করে বলতেও বাধা ছিল। গত নব্বইএর শেষে একটা ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে গিয়ে দেখি "ভ্যালেন্টাইন'স ডে" তে বেশ নামী কাগজের একটা পুরো পাতা জুড়ে ছাপা হয়েছে কত হৃদয়-বিদারক বিলাপ আর মনোমুগ্ধকর প্রলাপ। তাও আবার পয়সা দিয়ে! লিখেছেন অবশ্যই প্রেমিক-প্রেমিকা সুজনরা। মাত্র একটা জন্মে 'প্রেমের' এতখানি বিবর্তন! তাই ভাবলাম যে এই ফেব্রুয়ারী মাসে ভ্যালেন্টাইন ডে'র খাতিরে সমাজ ও সাহিত্যে যুগল প্রেমের রূপ বদলটা নিয়েই একটু কিছু লিখি।

ইংরেজীতে 'লাভ' (অথবা 'লভ') কথাটার মূল সন্ধানে গিয়ে দেখি যে ব্যাপার বেশ গোলমেলে। তবু এরই মধ্যে এক পন্ডিত লিখেছেন "সংস্কৃত শব্দ লুভ্যিয়াতি (he or she desires) কিংবা লোভয়তি (to cause to desire) থেকেই হয়ত 'লভ' কথাটার জন্ম। বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে দেহজ কামনাটা 'প্রেমের' একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ। এবারে নিচে লিখছি প্রেমের লক্ষণ কি কি।

১)প্রেমিক সত্যিকারের যোগ্যতা থাকুক বা নাই থাকুক, নিজেকে প্রেমের যোগ্য বলে মনে করে।

২)প্রেমে পড়লে মানুষ অনেক সময়ে নিজের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে; ভালবাসার বন্দী হয়ে বিসর্জন দেয় আত্মসন্মান।

৩)প্রেম সাহসও জোগায় আবার প্রেমের ঘূর্ণীতে পড়ে মানুষ খাবিও খায় একই ভাবে।

৪) বাবা-মাকে লুকিয়ে প্রেম করা – এর যুক্তিটা হোল যে তাঁদের বাঁধন ছিঁড়ে আর একজনের বাহু-বন্ধনে ধরা দেওয়া – তওবা তওবা!

৫)ভালবাসার মানুষটিকে প্রকৃতির সাথে তুলনা করা – "তার ঘন বাদামী চোখ দুটোতে যেন মধ্য রাত্রের প্রগাঢ় অন্ধকার। তার ওষ্ঠ দুটিতে ভোরের শিশিরের স্নিগ্ধতা"। বাঙলা তথা অন্যান্য সাহিত্যেও এর ভুরি ভুরি উদাহরণ মিলবে।

৬)প্রেমের স্পর্শে সমস্ত চেতনা তীব্র হয়ে ওঠে।। হায়রোগ্লিফের কবি লিখেছেন "তার (প্রেমিকার) আঙুলের স্পর্শে আমার চোখের সামনে যেন ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়তে লাগল।" তিন হাজার বছর আগেকার এই অভিব্যক্তি কি আমাদের অনুভূতির বাইরে?

ইতিহাসের এক গবেষক বলেছেন "রোমান যুগে প্রেমিকাদের প্রচুর স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু সৃজনশীলতা বা বুদ্ধির পরিচয় না দিলেই তারা নিরাপদে থাকত।" আমাদের যুগে 'যাযাবর' লিখেছিলেন "প্রেমে পড়লে মানুষ বোকা হয়ে যায়'। তার মানে প্রেম আর বুদ্ধিমত্তার চলনটা এক হয়না।

ইয়োরোপে মধ্যযুগে চার্চের বড় কর্তারা সোচ্চারে বলতেন "ভগবৎ প্রেমই প্রেম। নারী-পুরুষের প্রেম অশ্লীল!" আমার যুগটা অবধি তো তাই জেনেছিলাম দেশের সমাজে।

রামায়ণ-মহাভারতের যুগে প্রেমটা ছিল পুরুষপ্রধান এবং সম্পুর্ণভাবেই দেহজ। মুনি-ঋষি, রাজা-রাজড়ারা সুন্দরী রমণীকে দেখা মাত্রই আসংগলিপ্সায় উন্মাদ হয়ে উঠতেন। মনটাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনতেন না এঁরা । ওরই মধ্যে রাম-সীতার প্রেম জনসাধারণের মনে আজও দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা বলে সন্মানিত। অথচ অভাগিনী সীতার অবমাননার কথাটা চিন্তা করে দেখুন। তবে এসবই দেব-দেবীদের পুরা কাহিনী।

আনুমানিক পঞ্চম শতকে কালিদাস ও তাঁর সমসাময়িকদের কাব্য ও নাটকে হয়েছিল মানবিক প্রেমের আবির্ভাব। যদিও নায়ক-নায়িকারা ছিলেন ওই দেব-দেবী, রক্ষ-যক্ষরাই। তবু তাঁদের প্রেমের বর্ণনায় ছিল হৃদয় ও দেহের অপূর্ব মিশ্রণ। 'কুমারসম্ভব'-এর উমা যেন দেবী নন – প্রেমভারনতা একটি নারী! তবে কিনা প্রেমের পিচ্ছিল পথে পপাত হতেন নায়িকারাই। এতো আজও হয়ে চলেছে এই ফেমিনিজমের যুগেও।

বৈষ্ণব সাহিত্যের আমলে ইসলামের পদার্পণ ঘটেছে ভারত তথা বংগভূমে। নানা কারণেই সামাজিক অনুশাসনে মেয়েরা বন্দী হয়েছেন পর্দার আড়ালে । এটা ঐতিহাসিক সত্য। বৈষ্ণব পদকারেরা সুললিত ভাষায় ও ছন্দে আঁকলেন রাধাকৃষ্ণের যুগল প্রেমের ছবি, কিন্তু তার ওপরেও পড়ে গেল 'দেহাতীত প্রেমের' শীলমোহর। ভক্ত কবি বললেন "কানু হেন প্রেম, নিকষিত হেম, কাম-গন্ধ নাহি তায়'। ওদিকে মানিনী রাধা বলছেন তাঁর শ্যামচাঁদকে স্ফুরিতাধরে "চাঁচর কেশের চিকণ চূড়া, সে কেন বুকের মাঝে?" সিন্দূরের দাগ আছে সর্ব গায়ে, "বঁধু, মোরা হলে মরি লাজে"। কিংবা "অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে, ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি" । এর কার্য্য-কারণ আর প্রাঞ্জল ভাষায় বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ প্রেমের ব্যাখ্যাটাই চাপে পড়ে হয়ে গিয়েছিল অন্যরকম, যা পঞ্চাশ-ষাটের দশক অবধিও প্রত্যক্ষ করেছি দেশে।

'প্রেম' কিন্তু রয়েই গেল, জ্বলতে লাগল ধিকি ধিকি করে তুষের আগুনের মত। এই জ্বলনেরই তাপে জ্বলতেন সে যুগের মুঘল রাজকুমারীরা পর্দার আড়ালে; দেহজ কামনাটিকে মিটিয়ে নিতেন 'যেন তেন প্রকারেন'। শাহজাহান বাদশার দুই বিদুষী কন্যা – জাহানারা আর রোশনারা অপূর্ব প্রেমের কবিতা লিখতেন ফার্সিতে। আর তাঁদের জেনানা মহলে চলত প্রেমিকপ্রবরদের আনাগোনা। ধরা পড়ে গেলে অবশ্য সে বেচারাদের মুন্ডু খসে যেত ধড় থেকে, অথবা প্রেমিকার হামামের ফুটন্ত গরম জলে সেদ্ধ হয়ে হাড়ি কাবাব বনে যেত তারা। তবে প্রেমিকারা কিন্তু নিরাপদেই থাকতেন।

এরই পাশাপাশি সেকালের রাজপুতানার বেশ কিছু মর্মস্পর্শী প্রেমগাথা অমর হয়ে আছে চারণ কবিদের গানে। এঁরাও ঐতিহাসিক চরিত্র। অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী'তে সন্ধান মিলবে এঁদের ।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় 'প্রেম'কে যাচাই করলে দেখা যায় যে সমাজের বাঁধন যতই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে, বিকৃত যৌন চেতনা ততই প্রকটিত হয়েছে। 'বটতলা সাহিত্য' দ্রষ্টব্য। এর মধ্যে নানা সাহিত্যিকের হাতে রদ বদল ঘটল বাংলা সাহিত্যের। অবশেষে এলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্যে এল যুগান্তর। দেহমনের মাধুর্য্যটিকে একাকার করে দিয়ে তিনি লিখলেন

'রাত যেন না বৃথা কাটে, প্রিয়তম হে,

এস নিবিড় মিলন ক্ষণে, রজনীগন্ধার কাননে,

স্বপন হয়ে এস, আমার নিশীথিনীতে...'

তারপর দিলেন আমাদের অবাধ কল্পনার অবকাশ। এখন আর সেই অবকাশটুকু মেলে না পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই। যৌনতা নেমে এসেছে এখন অশ্লীলতার পর্য্যায়ে। সমাজেও তার প্রতিফলন দেখছি – সবই ঘটছে প্রয়োজনে। আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই 'প্রেমও' যাচ্ছে ফুরিয়ে। অথচ এখন প্রেমটা সর্বত্রই বেশ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে – তবু কেন প্রেম সগৌরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে না! হঠাত আসা বৃষ্টির মত প্রেম যা স্নিগ্ধ ধারাজলে মনটাকে সরস করে তোলে তার দেখা কেন আর পাই না – সমাজে বা সাহিত্যে?

****

পথে যেতে

ডক্টর ঝর্ণা চ্যাটার্জী

পেরুর রাজধানী লিমা থেকে মাচু পিচু যাবার সময়ে ট্রেনে কিছু স্থানীয় লোক আলপাকার চমৎকার সোয়েটার, স্কার্ফ, জ্যাকেট ইত্যাদি বিক্রী করার চেষ্টা করছিল। তখন থেকেই ঘটনাটা শুরু হয়েছিল। দুষ্টুমি করে খ্যাপানো, ভাল মানুষের মত মুখে "এই আলপাকার সোয়েটারটা আমাকে তুমি কিনে দেবে বলেছ বলে অনেক ধন্যবাদ!" এই সব চলল সারা পথ ধরে। ট্রেনের কাঁচের ডোমের মধ্য দিয়ে তুষারকিরীট-পরা পাহাড়ের চূড়ার ছবি নেবার জন্য কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে ছুটোছুটি করছি, তার মধ্যে খেয়াল করিনি যে অনেক সহযাত্রীদের মধ্যে সেই একটি সুদর্শন, প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাকে সমানে লক্ষ্য করে চলেছে। একবার ডেকে দেখাল তার নিজের ক্যামেরায় আমার একটা ছবি। আরো অন্য সহযাত্রীদের ছবিও ছিল। নাম জিজ্ঞেস করলাম, দুষ্টু হাসি হেসে বলল "নামের দরকার নেই, 'এই যে, শোন' বললেই আমি সাড়া দেব।" হাসি পেল, কিন্তু খ্যাপাবার ভয়ে বলতে পারলাম না যে আমাদের সমাজে ঐ ধরণের ডাকটা একান্ত অন্তরঙ্গ ডাক, একান্ত অন্তরঙ্গ সম্পর্কের দ্যোতক।

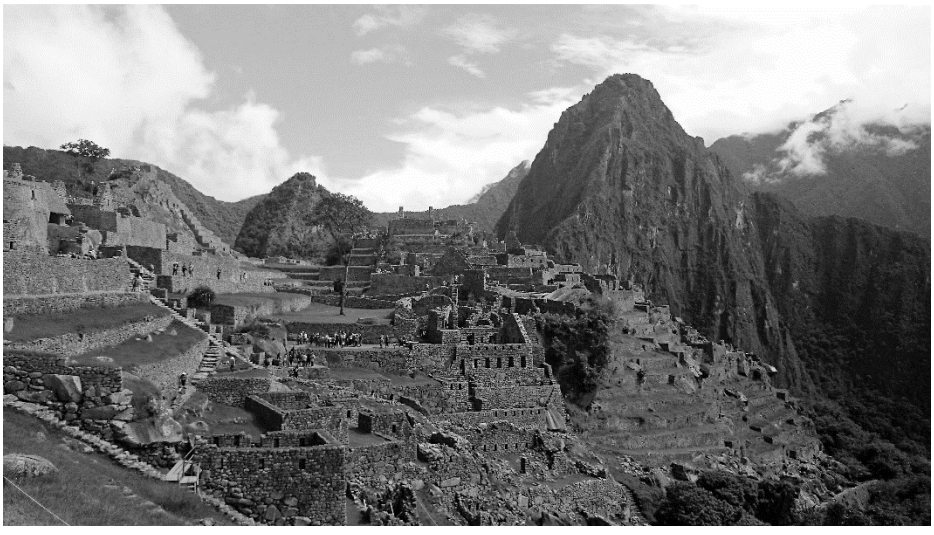

মাচু পিচু দেখার স্বপ্ন আমার অনেক দিনের। পাহাড়ের মাথায় ইনকাদের এই বিস্ময়কর সৃষ্টির ধবংসাবশেষ দেখতে সারা পৃথিবীর লোক ছুটে আসে। আমরা লিমা থেকে কাঁচের ডোম দেওয়া ট্রেনে মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে গেলাম 'এগোয়া কেলিএন্টিস' (এর অর্থ – ফুটন্ত জল -বোধ হয় নদীর রূপ বর্ণনা করে) স্টেশনে, সেখান থেকে ঐ শহরের বাসে পাহাড়ের কোলে কিছুটা পথ উঠলাম। তারপর শুরু হোল গাইডকে অনুসরণ করে তিন ঘন্টা চড়াই-উতরাই, রেলিং-ছাড়া পাথরের উবরো-খাবরা উঁচু সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, নামা, তার মাঝে মাঝে থেমে থেমে এই অসামান্য ধবংসাবশেষ মন আর দুচোখ ভরে দেখা, আর সেই প্রাচীন ইনকাদের পরিকল্পনার কুশলতা, বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি অনুভব করা। রাজার শোবার ঘর, বীজের ও খাবার জন্য আলাদা আলাদা শষ্যাগার, মা ধরিত্রীর,সূর্যদেবের ও কনডরের মন্দির, বলির বেদী, সেচনের ও পানীয় জলের ব্যবস্থা, পাথরের দেয়ালে ছাউনী বাঁধার ব্যবস্থা – বিস্ময়কর। ওরা সূর্য দেবতা, মা ধরিত্রী ("পাচামামা" – উর্বরতার ও ফসলের দেবী), কনডর পাখি, পর্বত, এদের পূজা করত। দেবতাদের সন্তোষের জন্য ফল, শস্য, জীব-জন্তু, এমন কি কখনো কখনো মানুষ বলি দিত। পুরোটা দেখবার মত শারীরিক ক্ষমতা থাকবে কিনা এ সন্দেহ আমার ছিল, তাই তিন ঘন্টা পরে যখন গাইড নেমে আসার কথা বলল, তখন দারুণ খুশি হয়েছিলাম – স্বপ্ন সফল করতে পেরেছি!!! পাহাড় থেকে নেমে এসে ওখানেই একটি কাফেটারিয়াতে দুপুরের নিরাড়ম্বর খাবার খেয়ে বাস নিয়ে সুম্যাক হোটেলে পৌছলাম।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় হোটেলের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নে অপরূপা, দুরন্ত নৃত্যশীলা নদীটির দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম একটু কাছে গিয়ে দেখলে কেমন হয়। যেন আমার ইচ্ছে পূর্ণ করার জন্যই সহসা আবির্ভাব হোল 'এই যে,শোন'-র। আমাকে বলল, "একটু হাঁটতে যাবে নদীর ধারে?" বৃথা বাক্য ব্যয় না করে পা বাড়ালাম পথে। সযত্নে হাত ধরে আমাকে রাস্তা পার করাল, তার পর খরস্রোতা উরুবাম্বা নদীর ধারে পায়ে-চলা পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম পাশাপাশি। ছোট-বড় পাথরের ওপর দিয়ে, তার চারদিক ঘিরে নদীর স্রোত না-বলা কোনও আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, আর শাদা ফেনার মধ্যে লুকোচুরি খেলছে, হয়তো-বা কিছু বলতেও চাইছে – যদি আমরা হৃদয় দিয়ে তা অনুভব করতে পারি। পথের দুপাশে ফুলের গাছে উজ্জ্বল হলুদ রঙের থোকা থোকা ফুল আর বড় বড় পয়েনসেটিয়ার গাছে ফুলের মত রঙিন পাতা। মাঝে মাঝে পাখিদের নরম ডাক শুনতে পাচ্ছি, ঘরে ফেরার গান। দু'একটা সাধারণ কথার বেশি বলি নি আমরা, শুধু এই শান্ত, সুন্দর পরিবেশটুকু উপভোগ করছিলাম মন-প্রাণ ভরে। যেন কথা বললে তার রেশ কেটে যাবে।

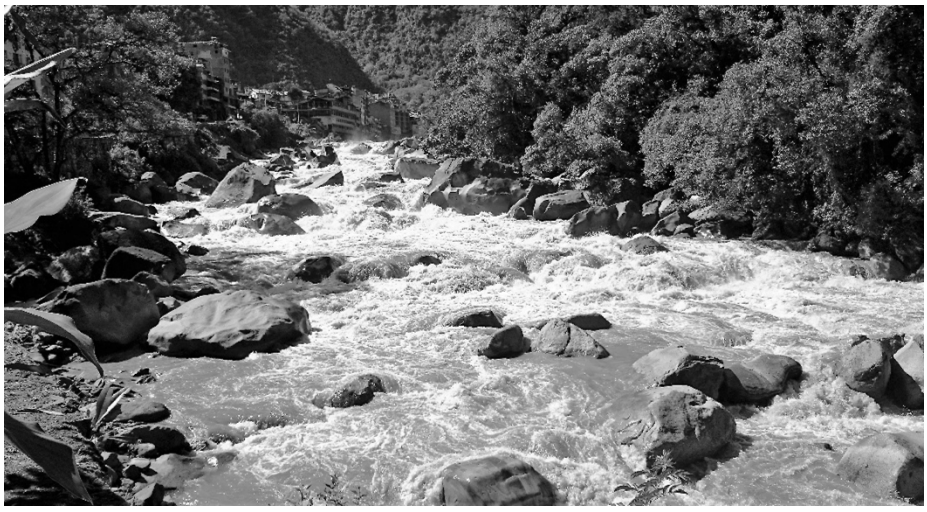

তার পর এখানে ওখানে, হোটেলের ডাইনিং রুমে ডিনার বা ব্রেকফাস্ট খাবার সময়ে তাকে দেখতে পেতাম। প্রায় সব সময়েই একা। একটা কোণে গিয়ে অনেক সময়েই সবার দিকে পিছন ফিরে বসে খাচ্ছে, তার পর উঠে চলে যাচ্ছে। অথবা লাউঞ্জে একা বসে বই পড়ছে। যেন

সবার মধ্যে থেকেও একলা। অথচ ট্রেনে দেখেছি – মোটেই লাজুক, বেরসিক বা অসামাজিক ধরণের লোক সে নয়। একদিন ডাকলাম, ঠাট্টা করে বললাম, "আমাদের থেকে অত দূরে গিয়ে একলা একলা বসে খাচ্ছ কেন? এখানে তো একটা চেয়ার খালি পড়ে আছে, চলে এসো না আমাদের টেবলে।" খাবার হাতে নিয়ে উঠে এল। হালকা নানা কথার মধ্যে খাওয়া শেষ হোলো আমার বান্ধবীর আর আমার। 'এই যে, শোন'-র তখনো খাওয়া শেষ হয় নি। আমার বান্ধবী বলল ওর কিছু কাজ আছে ঘরে, ও তাই উঠে চলে গেল। আমিই তাকে ডেকেছিলাম, তাই সঙ্গ দেবার জন্য বসে রইলাম।

হঠাত কি মনে হোলো তার জানি না, বলল "জানো, আমার স্ত্রী মারা গেছে সাড়ে এগারো বছর আগে, কিন্তু আমি এখনোও তাকে আমার হৃদয়ের মাঝখানে নিয়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াই।" আমি বললাম "নিশ্চয়ই সে অসাধারণ মেয়ে ছিল।" এর পরে আমার আর কিছু বলতে হোলো না। আমেরিকার কোনও এক শহরে ওদের পরম সুখের সংসারের গলপ, তার পর ওর স্ত্রীর ক্যান্সার ধরা পড়ার, সুদীর্ঘ এবং দুঃসহ চিকিতসার পরে আপাত-আরোগ্য, আর তার পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে আবার সেই মারাত্মক রোগ ফিরে আসার কাহিনী, তার শেষ দিনগুলোর এবং শেষ মুহূর্তের করুণ স্মৃতি, - কান্নার স্রোতের মত উপচে পড়ল ওর বুক ও মুখ থেকে। আমি নিঃশব্দে শুধু শুনলাম। সব বলা হলে আমি বললাম "তুমি যে আমাকে তোমার এত নিজস্ব কথা বলতে চেয়েছ, তার জন্য আমি সম্মানিত বোধ করছি।" ও আলগোছে আমার হাতখানা একটু ছুঁয়ে বলল "তোমাকে দেখে প্রথম থেকেই বুঝেছিলাম তুমি খাঁটি, কোনোও কৃত্রিমতা নেই তোমার মাঝে। তুমি জানো না তোমার মত সরল আন্তরিকতা আর মায়াময়, সংবেদনশীল মন কতটা দুর্লভ। আমার সৌভাগ্য আমি সেটা দেখতে পেয়েছি।" ওর গভীর দৃষ্টির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম, কি বলব ভেবে পেলাম না। এ কেমন মানুষ? মাত্র এই ক'টি দিনে, এত অল্প সময়ে কেন আমাকে ও এমন ভাবে দেখেছে? "সন্ধ্যা বেলায় এ কোন খেলায় করলে নিমন্ত্রণ"?

মাচু পিচুর পরে আবার যাত্রা শুরু। কুসকো হয়ে পুনোতে যাব। কুসকো সমুদ্র থেকে অনেকটা উঁচুতে - ১১,০০০ ফিট। আমার ধারণা ছিল আমি কষ্টসহিষ্ণু, কিন্তু আমার অবাধ্য, সমুদ্র-সমতলবাসী শরীর বিদ্রোহ করল। প্রচলিত প্রতিষেধক কোকা পাতা সেবন সত্ত্বেও নিঃশ্বাসের কষ্টে শহরের মধ্যে উঁচু-নীচু ঢালু পথে চলতে পারছি না – অথচ কোন কিছুই বাদও তো দিতে চাই না। এমনি করে দেখা হোল ওখানকার ঐতিহাসিক চার্চ , ইনকাদের তৈরী অপূর্ব সূর্যমন্দির আর তার প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ। ভূমিকম্পে এর অনেক পরে তৈরী কত বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে পড়েছে, কিন্তু এখানকার আর মাচু পিচুর আসল স্ট্রাকচার আজও সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। আরও বিস্ময়কর বিষয় হোল কোথাও চূণ-বালি-সুরকী জাতীয় কিছুর ব্যবহার নেই। শুধু বিশাল বিশাল পাথরের ওপর বিশাল বিশাল পাথর নির্ভুল হিসেবে খাপে খাপে বসানো। যেন দৈত্যদের জিগ স পাজল। কি করে ঐ বিশাল পাথরের ওপরে অতখানি উঁচুতে অন্য ভারী পাথরগুলো তুলে বসাল সেটাও ভেবে পাই না।

এর পরের গন্তব্যস্থল পুনো আরও একটু উঁচুতে, বোধ হয় ১২,৫০০ ফিট। কিন্তু ওখানে আমাদের ক্লান্তিকর হাঁটা-চলার প্রয়োজন হয়নি, আর এর মধ্যে হয়তো একটু অভ্যস্তও হয়েছিলাম অক্সিজেনের স্বল্পতায়। আমাদের মনোরম হোটেলটি একেবারে লেক টিটিকাকার ধারে। হোটেলের মাঠে দেখি আলপাকা আর লামা ঘুরে ঘুরে ঘাস খাচ্ছে। বিনা পরিশ্রমে, প্রাকৃতিক ভাবে ঘাস কাটা হয়ে যাচ্ছে। শুনলাম এতখানি উচ্চতায়

নৌকো চলার মত লেকগুলির মধ্যে লেক টিটিকাকা সবচেয়ে বড়। নব্বুইটি ভাসমান দ্বীপ আছে এর মধ্যে। লেকের মধ্যে জন্মায় পাটগাছের মত 'রীড"(শর, নল বা বেণু-বাঁশ) — তাই দিয়ে তৈরী দ্বীপ। পাকা ধানের মত সোনালী রঙের দ্বীপে সোনালী রীডের কুটির, পায়ের নীচে সোনালী রীডের জমি, দ্বীপের ধারে ঘন নীল জলে হালকা সোনালী রঙের রীডের তৈরী নৌকো। সে নৌকো দাঁড় বেয়ে চালায় প্রধানত আদিবাসী মেয়েরা, তাদের পরণে ঝলমলে রঙের লম্বা স্কার্ট আর ব্লাউজ, পিঠে নেমে গেছে লম্বা কালো চুলের বিনুনী, তার তলায় রঙিন সূতোর থোপা। সব মিলিয়ে এ যেন এক রূপকথার দ্বীপ।

অনেক দিন আগে পর্তুগীজ আগন্তুকদের অত্যাচার থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্য এখানকার আদিবাসীরা শুরু করেছিল পায়ের তলার শক্ত মাটি ছেড়ে ভাসমান দ্বীপ গড়া, আর সেখানে শান্তিতে বসবাস করা। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ, এমন কি 'সোলার প্যানেল'দিয়ে এদের 'এনার্জী'র প্রয়োজন মেটে। মাছ ধরা, পাখি শিকার করা এদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার অঙ্গ। আর এদের মেয়েরা ট্যুরিস্টদের কাছে নিজেদের হাতে তৈরী নানা জিনিস বিক্রী করে — সূতো বা আলপাকার পশম দিয়ে বোনা ছোট-বড় ওয়াল হ্যাঙ্গিং — সেগুলো সূচীশিল্প দিয়ে সাজানো, আর ব্যাগ, পোড়া মাটির গয়না, এই ধরণের পসরা।

পুনোতে পৌঁছোবার পরের দিন সকালে আমরা ষ্টীমারে করে একটা ভাসমান দ্বীপে গেলাম। ওখানে কিছুক্ষণ ওদের জীবন-যাত্রার সব কিছু দেখা ও শোনার পরে আমাদের ছোট্ট রীডের নৌকো করে টিটিকাকা লেকের মধ্যে ঘুরতে যাবার কথা। আমি গাইডকে জিজ্ঞেস করলাম "ডুবে যাবে নাতো নৌকো?" গাইড কোন উত্তর দেবার আগেই আমাকে 'এই যে, শোন' বলল, "শুধু তোমার নৌকোটা ডুববে।" আবার সেই খ্যাপানো! আমি বললাম "যদি সত্যিই কিছু হয় তখন তোমার খুব খারাপ লাগবে কিন্তু।" নির্বিকার মুখে বলল "আচ্ছা, সে রকম কিছু হলে আমি তোমাকে তুলে আনব।" ওমা, নৌকোয় উঠে দেখি আমাদের নৌকোয় সে আগে থেকে উঠে বসে আছে। খানিক পরে আর একটা দ্বীপে নামলাম, একটুখানি কেনা-কাটার সুযোগ হোল। 'এই যে, শোন' দ্বীপের মাঝে নিজের কেনা ওয়াল হ্যাঙ্গিং দেখাচ্ছিল সবাইকে, হঠাত প্যাকেটের মধ্যে থেকে একটা ভারী সুন্দর মাটির পেন্ড্যান্ট বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল "এটা তোমার জন্য।"

এর পরে যথারীতি এখানে-ওখানে দেখা হোলো কয়েকবার। আমাদের একসাথে শেষ বারের প্লেনের ট্রিপ ছিল কুসকো থেকে লিমায় ফিরে আসার জন্য। ভাগ্যের ফেরে অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের সীট পড়ল পাশাপাশি। আইলের দু'ধারে। বই পড়ছিল সে। হঠাত বই সরিয়ে রেখে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আসবে আমার বাড়িতে কোনো দিন, আমার সঙ্গে দেখা করতে ?" চুপ করে ভাবলাম এক মিনিট। তারপর বললাম,"পথের আলাপ পথেই থাক, বন্ধু! কিন্তু আমি তোমায় ভুলব না।" শুনে কোনও উত্তর না দিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথাটা একটু নুইয়ে ডান হাত নিজের হার্টের ওপর ছোঁয়াল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল "আমার আলপাকার সোয়েটারের বিলটা শীগগীরই পাবে। মিটিয়ে দিও কিন্তু।" প্লেন পৌঁছে গিয়েছিল লিমা এয়ারপোর্টে। কেউই ফিরে তাকালাম না আর, চাইলাম না গড়তে ফোন নাম্বারের ছোট্ট সেতু। আবার যে যার জীবনের অজানা কক্ষপথে পা বাড়ালাম। পিছনে পড়ে রইল কয়েকদিনের করুণ-মধুর স্মৃতি। অর্থহীন, না অমূল্য? কে জানে!

- এই লেখার মধ্যে দেওয়া সব ক'টি ছবি — ইচ্ছে করেই শাদা-কালো রূপ - লেখিকার তোলা; গল্পটি সত্যি আর কল্পনায় মেশানো। উত্তম পুরুষে লেখা হলেও চরিত্রগুলি কাল্পনিক।

****

উৎসব/ Utsav

সুদীপ ঘোষ

মা আসছে! পূজার দামামা বেজে গিয়েছে পশ্চিমবাংলায়। আকাশে পেঁজা পেঁজা শরতের সাদা মেঘের হাতছানি। শিউলি ফুলের সুগন্ধে চারিদিক ভরে গেছে এবং রেডিওতে আগমনীর গান বাজছে। পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডপ বাধার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। পূজায় নতুন ফ্যাশানের জামা, জুতো, ট্যাবলেট, নতুন মডেলের স্মার্ট ফোন আর স্মার্ট ঘড়ি কেনার প্রতিযোগিতা চলছে।

কুমারটুলিতে কাজ চলেছে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে। আর বেশি সময় নেই দেবী পক্ষ শুরু হতে। সংবাদপত্র আর টেলিভিশন চ্যানেলগুলো ক্রমাগত জনগণকে অবগত করে চলেছে কলকাতার কোন পূজা কোন থিমের উপর মণ্ডপ সজ্জিত করছে। তাই এখানেও চলছে ইঁদুর দৌড়, পূজা কমিটিগুলোর মধ্যে.....পূজার দিনগুলোতে লোক টানার প্রতিযোগিতা। এই সুযোগে কর্পোরেট দুনিয়াও হাজির টাকার থলি নিয়ে নামী-দামী পূজো স্পন্সর করতে। তিলোত্তমা কলকাতা নবরূপী বধূর মত আলোকসজ্জায় সেজে উঠছে দেবীদুর্গা আর উনার সন্তানদের বরণ করে নেবার জন্য। এই সব দৃশ্যপট আমি এই সুদূর কানাডাতে বসে আমার মানসচোখে কল্পনা করতে পারছি।

দুর্ভাগ্যবশত এই আলোক মণ্ডিত উৎসবময় পরিবেশেও আমরা হয়ত পাদপ্রদীপের নীচের অন্ধকারই দূর করার সর্বাঙ্গীন চেষ্টা করছি না। স্বামী বিবেকানন্দর অমর বানী" জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর "আমরা হয়ত আজ ভুলে যেতে বসেছি। তথাকথিত নামী-দামী পূজা কমিটিগুলো লাখ লাখ টাকা খরচ করছে প্রতি বছর মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা আর প্রতিমাসজ্জায়। কিন্তু সেই খরচের একটা অংশও যদি গরীব মানুষের কল্যাণে অতিবাহিত হত তাহলে হয়ত আমরা প্রকৃত উৎসব পালন করতাম। একটি গরীব শিশুর মুখের সরল হাসি অর্জন করা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড প্রদত্ত" শারদ সম্মানের "থেকে অনেক বেশি গর্বের।

আমি অস্বীকার করছি না যে, অনেক পূজো কমিটি পূজোর সময় অনেক সমাজকল্যানমূলক কাজ করে কিন্তু এই প্রয়াস সর্বাঙ্গীনভাবে সকল পূজো কমিটির মধ্যে দেখা যায় না। তবে প্রয়াস শুধু পূজা কমিটির নয় প্রত্যেক পরিবারকে দেখাতে হবে। প্রতিটা পরিবার যদি নিজেদের সাধ্যমত একটি গরীব শিশুর জন্য পূজোর সময় একজোড়া নতুন কাপড় কিনে দিতে পারে তার থেকে বড় উৎসব পালন আর কিছু হতে পারে না।

প্রাকস্বাধীনতার সময় থেকে সংবাদপত্র এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে এসেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমানে সর্বপ্রচলিত সংবাদপত্রগুলো প্রধানত রাজনৈতিক, বিনোদনমূলক আর ক্রীড়াজগতের সংবাদ প্রদানেই নিমজ্জিত থাকে। কিন্তু সারা বছর ধরে এবং পূজার সময় রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম অথবা অন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো সমাজের জন্য যে অবিরত কাজ করে চলেছে তার কতটুকু খবর সংবাদপত্রগুলো মানুষকে অবগত করছে?

দেশান্তরীর অধিকাংশ সদস্যেরই ভারতবর্ষ হল জন্মভূমি এবং কানাডা হল কর্মভূমি। আমরা দু দেশের প্রতিই ঋণী। সেই ঋণ শোধের জন্য দেশান্তরী এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে দেশান্তরীর অনেক সদস্য আজ বহু বছর ধরে অনেক সমাজকল্যাণ মূলক কাজে যুক্ত থেকে এসেছে যথা ত্রাণ-সাহায্যের জন্য সংগ্রহ, রেড ক্রস, ক্যানসার সোসাইটি এবং টেরি ফক্স ফাউনডেশান ইত্যাদি সংস্থার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা ও তাদের গুরুত্বপূর্ণ গবেষনায় এবং বিভিন্ন কাজে অবদান রেখে এসেছে।

তবে আজ হয়ত ভাবার সময় হয়েছে দেশান্তরী কি ভাবে আরও সমাজকল্যানমূলক কাজে যুক্ত হতে পারে। আমি আশাবাদী - আশা করব দেশান্তরী আগামী দিনে আরও অনেক সমাজ কল্যাণমূলক কাজে যুক্ত থেকে বহু মানুষের মুখে হাসি ফোটাবে এবং উৎসবের দিনগুলোকে আনন্দে ভরিয়ে তুলবে।

****

গোল নিয়ে গোলমাল গোলাকার

আদিত্য চক্রবর্ত্তী

এই গোল নিয়েই গোলাকার ভূগোলে যত গোল। কোথাও কোন গোল দেখলেই শুরু হয়ে যায় যত গোলমাল। মাছের বাজারে, বাসের মধ্যে, বাজারের মাঝারে কারুর একটু পা মাড়িয়ে দিন বা কারুর সুন্দরী বউএর দিকে একবার গোল গোল চোখে তাকান তারপরে দেখবেন কেমন সবাই আপনাকে গোল করে ঘিরে গোলমাল শুরু করে দেয়! গোল গোল মাশুলওয়ালা হাত দিয়ে লম্বা আপনাকে তুলোধূনো করে কেমন গোলাকার করে দেবে! অবশ্য গোলাকার না করে ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজও করে দিতে পারে। সেটা হলে কিন্তু একটু অসুবিধা আছে। গোল হলে গোলগোল করে গড়গড়িয়ে বাড়ি যেতে পারেন কিন্তু অন্যরকম কিছু হলে কোন মতেই সেটা সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা। সে ক্ষেত্রে গোল গোল চাকাবাহিত হয়েই হাসপাতালে যেতে হবে আপনাকে।

ছোটবেলায় পরীক্ষার খাতায় গোল গোল শূন্য যোগাড় করায় আমি বেশ দক্ষ ছিলাম। বাবার কাছে সব সময়েই শুনতাম – আবার গোল— ঘাস কাটা ছাড়া আর কিছু হবেনা তোর। তোকে গোল থেকে মুক্তি দিতে পারে এমন কাকে পাই বলতো, হতচ্ছাড়া ছেলে!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল কোথায় যেন শুনেছি বা হয়তো দেখেও থাকতে পারি সেই গোলের গোলমাল নিয়ে ছড়া। ঠিক মনে পড়ছে না, সবই গন্ডগোল আমার এই গোলাকার মাথার মধ্যে। যাই , শুনুন তবে সেই ছড়া এবার।

গোল গোল আঁখি করি গদাধর গায়
গোলমরিচের সাথে আদাগোলা খায়।
গোল গোল চেহারার গোঁয়ার গোয়াল
গোশালা হইতে আসি করে নাজেহাল।
রসগোল্লা খায় বলি অঙ্কে পায় গোল
বলে ওটা হয়ে গেছে গোলে হরিবোল।
ঘুমঘোরে লাথি মারি বলে দিনু গোল
ছোটভাই জেগে উঠে করে বড় গোল।
গোলদীঘি মাঝে যদি কাটহ সাঁতার
গোলোকে আসন পাবে কহি বারবার।

আমার গোল মাথায় সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তাই বাকীটা অন্যসময়।

আমার গুরু অথ শিব্রাম চকরবরতি কথিত – গোবর্ধন মানে স্বনামধন্য হর্ষবর্ধনের ছোট ভাই রসগোল্লার হাঁড়ি থেকে রসগোল্লা মুখে দিয়ে বলে যে সে গোল্লায় যাবেনা বরং গোল্লাই তার মধ্যে যাবে। কি যে গোলমেলে কথা! আরেকটা বলি শুনুন। কানাই-বলাই দুই ভাই – কানাই বিয়ে করলো, তখন বলাই বাহুল্য। আবার একজনের নাম তারক পাল। ভোটার লিস্টে তার নাম হল "তার কপাল"।

গোলের জট ছাড়াতে কোথা থেকে যে কোথায় যাচ্ছি।

সেই এক বুড়ি ঠাকুমার গল্প যে কিনা বাজী ধরে এবং জিতে গিয়ে প্রচুর পয়সা করে। এই তো কদিন আগে সেই ঠাকুমা পৌঁছে গেলেন সেই শহরের এক বড় ব্যাংকের ম্যানেজারের ঘরে। উদ্দেশ্য টাকা জমা দেওয়া। কত টাকা জিজ্ঞাসা করায় খুবই কিন্তু কিন্তু করে বললেন এই

সামান্য দশ লাখ মত। ম্যানেজার খুশি হয়ে বললেন কোন অসুবিধে নেই – তো আপনি করেন কি? – এই খেলাধূলো বা যে কোন জিনিস নিয়ে বাজী ধরি। এই যেমন ধর ম্যানেজারবাবু তুমি পরচুলা পরেছ।

-- মোটেই না।

-ঠিক আছে – এক লাখ টাকার বাজী। কাল সকাল এগারটার সময় আমি আসব এর ফয়সালা করতে।

ম্যানেজার তো খুব খুশী বেশ বিনা পরিশ্রমেই টাকা রোজগার হবে বলে। পরদিন ঠাকুমা এলেন উকিলকে সঙ্গে নিয়ে। এক্কেবারে পাকা কাজ উকিল সাক্ষী রেখে।

ঠাকুমা -আমি কিন্তু তোমার চুল টেনে দেখব।

ম্যানেজার রাজী। তখন ঠাকুমা ম্যানেজারের চুল টানলেন, ম্যানেজার ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল আর অন্যদিকে উকিলবাবু কাঁদতে কাঁদতে দেওয়ালে মাথ ঠুকতে লাগলেন। এসব দেখেশুনে ম্যানেজার বলল যে উকিলবাবু ওরকম করছেন কেন।

-আরে আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল। আমার সঙ্গে ঠাকুমা বাজি ধরল পাঁচ লাখ টাকার কিনা এই ব্যংকের ম্যানেজারের চুল ধরে টানবে। এখন আমি চুল ছিঁড়ব নাতো কি করব?

মাঝখান থেকে এই গোলমেলে বাজি ধরে আমাদের এই বুড়ি ঠাকুমা চার লাখ টাকা জিতে গেলেন।

এইবার বলি দুই গুলিখোরের সত্যি গল্প। তো তারা আফিং খেয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছে। একজনের হাতে টর্চ। সে একটা বাড়ির ছাদের দিকে আলো ফেলে অন্যজনকে বলল --তুই এই আলো বেয়ে উপরে উঠে যেতে পারবি? সেই বন্ধু হাহা করে হেসে বলল –অত নেশা হয়নি যে এই চালে ভুলব। আমি উপরে উঠতে শুরু করি আর তুই দুম করে আলো নিবিয়ে দে। তখন আমি পড়ে হাতপা ভাঙব না!

আজ আমার গোল করা কথার শেষ। এখন আমার কি অবস্থা জানেন তো – ভূগোলেতে গোলেমালে ইতিহাস পড়ে আমি হয়েছি পাগোল!!!

****

সেদিন (ঘূর্ণি) ঝড়ের রাতে

মদনমোহন ঘোষ

ছবি: সেপ্টেম্বর ২১, ২০১৮, অটোয়া সিটিজেন।

আজ গ্রীষ্মের শেষ দিন। আকাশটা সারাদিনই মেঘলা। মাঝে মাঝে হালকা, আবার কখনও বা বেশ জোরে বাতাস বইছে। এবছর গরমে গড় তাপমাত্রা এবং উষ্ণতম দিনের সংখ্যা দুইই অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী ছিল। শরতের আগমনের আভাষ কিছুদিন আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। পর্ণমোচী গাছেদের পাতা ঝরানো শুরু হয়েছে। বাড়ির সামনে ও পেছনের বাগানে মেপল, এ্যাশ, হর্ণবীন বা এসপেন গাছের কাঁচা, শুকনো বা আধ-শুকনো যেসব পাতা জমা হয়েছিল, মৃদু মন্দ ঝড়ে সেগুলো আজ রাস্তায় এসে পাক খাচ্ছে। গেরুয়া, লাল, হলুদ ও সবুজে মেশানো পাতাগুলো যেন রঙের খেলায় মেতেছে। ভাগ্যিস অটোয়া পৌরসভার গাড়ী এসে গুঁড়িয়ে মুড়িয়ে তছনছ করে ওদেরকে কম্পোস্টে পাঠায় নি। তাহলে মত্ত হাওয়ায় এমন পাগলামির দৃশ্য দেখা হতো না।

দুপুরে বেরিয়ে ছিলাম। কিছু বাজার করে ফিরতে ফিরতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। ঐশীর স্কুল থেকে আসতে আরও একটু দেরি হল। ওকে ওর ভায়োলিন ক্লাসে নিয়ে যেতে হবে। আর দেরি করলে চলবে না, তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে। পাশ থেকে আদেশ এল, "যাওয়ার পথে ঋতকে ওর কুমন ক্লাসে ড্রপ করতে"। আর তিনিও আমাদের সঙ্গে বেরুবেন। কাজে-কাজেই "টু-ডু লিষ্ট"-এ আর দুটো আইটেম যোগ হল। হাসু যাবে, মানে ঐশীর মিউজিক লেসনের ফাঁকে ওকে মাইকেলস্ এ নিয়ে যেতে হবে। শখের জুয়েলারী বানানো আছে যে! বেরুনোর মুখেই ঐশীর ফোনটা বেজে উঠল। কি ব্যাপার, এসময়ে তো ওর কোন ফোন পাওয়ার কথা নয়। বিক্রয়কারী সংস্থা বা কোন এন জি ওর ফান্ড রেইসিং ক্যাম্পেন হবে। কিন্তু ওরা ওর নম্বর পেল কোত্থেকে? ঐশীকে একটু বিব্রত মনে হল। "বাবা, এটা টরনেডো ওয়ার্নিং। যে কোনও মুহূর্তে টরনেডো হতে পারে। বাইরে বেরুতে না করছে। এখন কি করবে?" "সে কিরে! বলে কি, এখানে টরনেডো? চল্ আর কথা নয়। ক্লাসটা মিস করা যাবে না। তাছাড়া এখানে কখনো টরনেডো হয়েছে কি? এসব ওয়ার্নিংএর কোন মাথা মুন্ডু নেই। চল্ চল্ দেরি হয়ে গেল।"

সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মেয়ের কথায় একটু একটু চিন্তা ও হচ্ছিল। যদি সত্যি সত্যি টরনেডো হয়? বিশ্ব উষ্ণায়ন তথা আবহাওয়ার পরিবর্তনের যুগে এরকম একদা "এক্সট্রিম ইভেন্ট" এখন লেগেই আছে। আমেরিকাতে তো মাঝে মাঝেই হ্যারিকেন ও টরনেডো হচ্ছে। এছাড়া আমেরিকা ও কানাডাতে ওয়াইল্ড ফায়ারের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। তাই এখন এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিযোজন কৌশল নিয়ে তৎপরতাও শুরু হয়েছে। কয়েকদিন আগেই অন্টারিও ও কুইবেকে সেলফোনে সতর্কীকরণের পরীক্ষা হয়েছে। যারা এই সতর্কবার্তা পাননি তাদের বিশেষ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। ভ্যানটা নিয়েই বেরুলাম। ঝড় বৃষ্টিতে সুবিধা হয়।

রাস্তায় ভিড় অপেক্ষাকৃতভাবে কম। একেবারে চার রাস্তার ক্রসিংএ ট্রাফিক লাইটে থামলাম। তারপর তিন-চার মিনিট চলার পর ঋতকে নমিয়ে ঐশীর ভায়োলিন ক্লাসের উদ্দেশ্যে চলতে থাকলাম। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে এল। মেঘমালিকা এখন রুদ্রমূর্তি ধরেছে। পশ্চিমের আকাশটাকে সে তার ঘনকালো চুলের বেষ্টনীতে বেঁধে ফেলেছে। মাঝে মাঝে তার ভয়াল হাসিতে বুক দুরু দুরু করছে। আমরা তখন মাঝ রাস্তায়। গ্রীনব্যাঙ্ক রোডের দুধারে এই তিন-চার কিলোমিটারের মধ্যে কোন বাড়ি ঘর নেই। ডানপাশে বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে কেন্দ্রীয় কৃষি পরীক্ষার জমি। ফাঁকা মাঠে গ্রীষ্ম-শেষের সারি সারি কুমড়ো পড়ে আছে। কুমড়ো গাছ গুলো শুকিয়ে গেছে। ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। মেঘ ফুঁড়ে অস্তগামী সূর্যের যেটুকু আলো পড়ছে তাতে কুমড়োগুলো আরও লাল দেখাচ্ছে। খানিকটা এগুতেই গা ছমছমে ঘন পাইনের জঙ্গল। অবশ্য এগুলো ঠিক জঙলী-পাইন কিনা জানি না। বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত বনজ সম্পদও হতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশে জাতীয় আয়ে বনজ পদার্থ বিশেষ করে সফ্টউড লাম্বারের গুরুত্ব অপরিসীম।

ক্ষণিকের নিমেষে মেঘমালিকা আরও ভয়ঙ্করী হয়ে উঠল। তার উন্মত্ত নৃত্যে ঝড়ের দাপট শুরু হল। গাড়িটা দুলছে, টালমাটাল অবস্থা। এটাই কি টরনেডো! আগে কখনো টরনেডোর বা ঘূর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হই নি, তাই বুঝতে পারছি না। আমি স্টিয়ারিং ধরে বসে আছি। পেছন থেকে ঐশী চিৎকার করে উঠল, "ওমা দেখো, হাওয়াতে বড় বড় ডাল পালা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে"। তবে সেগুলো আমাদের থেকে একটু দূরে। গাড়িতে গাছের দু-একটা পাতা ও ছিটকে ডাল পড়ে ধুপ্ ধাপ্ শব্দ হচ্ছে। জঙ্গলটা রাস্তা থেকে দূরে হওয়ায় আমরা এখনো ঠিক আছি। সত্যি বোধ হয় টরনেডো এল। কিন্তু এখন কি করি, যাই কোথায়! দেখতে দেখতে মেঘমালিকা আকাশ ফুঁড়ে দাপিয়ে বৃষ্টি আনল। বড়বড় বৃষ্টির ফোঁটা যেন গাড়ীর ছাদ ভেদ করে চলে আসবে। বাইরে সবই ঝাপসা। গাড়ির হ্যাজার্ড লাইটটা অন করে দিলাম। চলন্ত ওয়াইপার সামনের কাচে বৃষ্টির জলের স্রোতের সঙ্গে লড়াই করছে। মুহূর্মুহূ জলের ঝাপটায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। গাড়িটাকে যেন কেউ ঠেলে ধরছে। উঁহু, এই বুঝি গাড়ীটাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তবু আস্তে আস্তে চলছি, না হলে অন্য গাড়ি এসে পেছনে ধাক্কা মারতে পারে। মাঝে মাঝে রাস্তার উল্টো দিক থেকে দু-একটা গাড়ী আমাদের পেরিয়ে যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাঠ পেরিয়ে ওয়েষ্ট হান্টক্লাব রোডে ট্রাফিক সিগনালে পৌঁছলাম। একটু পেরুলেই রাস্তার ওপাশে পুলিশ স্টেশন। দুধারে সারি সারি গাছ আর কাঠের পোষ্টের উপর দিয়ে ইলেকট্রিক তার গিয়েছে।

তবে গাছ গুলো আর অক্ষত নেই। গাছ থেকে বড় বড় ডাল-পালা ভেঙে রাস্তার উপরে এসে পড়েছে। তখনও ঝড়-বৃষ্টির পাঞ্জা লড়াই চলছে, তবে ঝড়ের তীব্রতা একটু কমেছে। এতক্ষণ ছিল পথে অন্য গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার ভয় আর এখন মনে হচ্ছে গাছ ও ইলেকট্রিক তার সহ ল্যাম্পপোস্ট ভেঙে ছুটে এসে আমাদেরকে যেকোনো মুহুর্তে আঘাত করবে। আর এগুনো ঠিক হবে না। পুলিশ-স্টেশনের পার্কিং এলাকাতে ঢুকে দেখলাম একটা গাছের অর্ধেকটা ভেঙে পড়ে আছে। পাশের গাছের ডালগুলো দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আমাদের গাড়িতে আঘাত করছে। না, এ জায়গাটাও নিরাপদ নয়। আবার বড় রাস্তায় উঠে, "প্রভু যীশু রক্ষে কর" বলে পাশের চার্চের ফাঁকা পার্কিং-এ আশ্রয় নিলাম।

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। ঋত ফোন করছে। ফোন ধরতেই বলল, "বাবা, কুমন সেন্টারে পাওয়ার চলে গেছে। আমাদের ক্লাস আজকের মতো ক্যানসেলড"। আরও এক সমস্যায় পড়লাম। এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এখন ওকে তুলতে যাই কি করে! এই মুহূর্তে বাইরে বেরুনোও নিরাপদ নয়। তাই বললাম, "তুমি ওখানেই থাক, বাইরে বেরিও না। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি আসছি। যদি ওরা তোমাকে ভেতরে থাকতে না দেয় তাহলে আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই"। ঋত বলল, "না, না ওরা আমাকে এখানে থাকতে দিচ্ছে, তোমরা সাবধানে এসো"। একটু আশ্বস্ত হলাম। এদিকে ঐশীর ভায়োলিন ক্লাসের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, আর এক কিলোমিটার গেলেই ওর শিক্ষিকা মিস মারিয়ার বাড়ি। কিন্তু যাওয়া যাচ্ছে না। ক্লাস ক্যানসেলেশনের জন্য ২৪ ঘন্টার নোটিশ দরকার, কোন মেকআপ লেসন হয় না। মারিয়াকে ফোন করা হল। ঝড়-বৃষ্টির প্রকোপ ওখানেও কম নয়। উনি বললেন, "no worries, are you guys ok?" কড়মড়িয়ে একটা বজ্রপাত শোনা গেল, ফোনটা কেটে গেল। আর পারা যাচ্ছে না, হচ্ছেটা কি? টরনেডো হলে রেডিওতে তো বলবে! তা নয়, গানের পর গান শুনিয়ে চলেছে।

এবার আকাশটা ফর্সা হয়ে এল। আর দেরি নয়। ছেলেটা ওখানে কিভাবে আছে কে জানে! ওকে তুলতে হবে। বেরিয়ে দেখি পুলিশ ডানদিকের রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়েছে। আমার দেখার আগেই হাসু বলল, "দেখো, দেখো, ওদিকের রাস্তায় একটা ইলেকট্রিক পোষ্ট ভেঙে পড়েছে একটা ট্রাকের উপর, আর ট্রাকটা ৪৫ ডিগ্রী কোনে পড়ে আছে একটা লাল গাড়ীর উপরে"। সত্যিই তো! এখানে লন্ড-ভন্ড অবস্থা। পুলিশ-স্টেশন ও ভিলেজ স্কোয়ার-মল সংলগ্ন গ্রীনব্যাঙ্ক রোডের উপর টিম হরটনের সাইনবোর্ড, কাগজের কাপ, পেপার টিসু, গারবেজ বীন, গাছের ডালপালা পড়ে আছে। সবাই অস্থির হয়ে উঠলাম। এক্ষুনি ঋতকে তুলতে হবে। লেফট টার্ণ নিয়ে রাস্তায় উঠলাম। রাস্তাটা একটু ফাঁকাই মনে হল। তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম কুমন সেন্টারে। ঋত গাড়িতে উঠল। ও ঠিকই আছে। ওখানে অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। আর কোথাও ঘোরাঘুরি না করে সোজা বাড়ি ফিরলাম।

বাড়িতে এসে দেখি ঘরে বাইরে কোথাও আলো নেই। বাইরে সামান্য আলো থাকলেও ঘরের ভেতর অন্ধকার। বিদ্যুৎ না থাকলে এখানে সবই অচল। ঋত ওর খেলার ছোট্ট ফ্লাশ লাইটা বের করল। বাড়িতে কিছু মোমবাতি আছে কিন্তু এই মুহূর্তে খুঁজে বের করা সহজ কাজ নয়। পাওয়ার আউটেজ এখানে হয় না। অন্তত কখনও পাওয়ার আউটেজের জন্য মোমবাতি জ্বালিয়েছি মনে পড়ে না। ঐশী ও ঋতর জন্মদিনে, আর কখনও বা রান্নার পর ঘরের বাতাসে একটু এরোমা সংযোজন করতে এর ব্যবহার হয়। ঋতর টিমটিমে লাইটে বেসমেন্টে গিয়ে এক গুচ্ছ টিলাইট পেলাম। এগুলো আগে কখনও ব্যবহার হয় নি। ব্যাটারিতে চলে। সুবিধে হল এর ব্যবহারে এখানে কাঠের বাড়িতে আগুন লাগার সম্ভাবনা নেই। বোতাম টিপতেই আলো ফুটল। সীমিত আলো, তবে এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে এগুলো শিবরাত্রির সলতের মত। সারা বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ওগুলো বসানো হল। কিচেনে, বসার ঘরে, সিঁড়ির পথে, বাথরুমে। তবু গা ছমছমে অবস্থা। মনে পড়ে ছোটো বেলায় এরকম হ্যারিকেন বা টেমির আলোয় মা ও ঠাকুরমার কাছে কত গল্প শুনেছি।

ঋত স্নান করতে গেল। চার-পাঁচ মিনিট পরেই বেরিয়ে এল। অল্প আলোয় বোধ হয় তেমন সহজ হতে পারছে না। অন্য দিন ডেকে বের করতে হয়। ওর ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই ঐশী ঢুকল। এক দু মিনিট বাদে বাথরুমে ধাক্কার শব্দে ঝিমুনিটা কাটলো। দৌড়ে গেলাম। কি হল আবার! ঐশী বলল, "বাবা, গরম জল আসছে না। আমি এত ঠান্ডা জলে স্নান করতে পারছি না"। বুঝতে আর বাকি রইল না। জল গরম হচ্ছে না। অর্থাৎ বয়লার কাজ করছে না। কিন্তু কেন, বয়লার তো ইলেকট্রিকে চলে না, চলে গ্যাসে। কি সমস্যা, কারণটা না জানলে আমি শান্ত হতে পারছি না। অনুসন্ধানের জন্য ফ্লাশ লাইটটা নিয়ে বেসমেন্টে ফারনেস রুমে গেলাম। এখানে সবই অন্ধকার। ফারনেস ও বয়লারের পাশে অল্প জায়গা। মেয়ে ও ছেলের জন্ম থেকে যত খেলনা, নার্সারি স্কুল থেকে শুরু করে শেষ শিক্ষাবর্ষের যত ক্রাফ্ট, স্কুল প্রোজেক্টের সামগ্রী, মাদার্স ডে ও ফাদার্স ডে'তে ওদের ছোট্ট হাতে বড়ো হৃদয়ে বানানো যত বন্ধন, ক্রিব, জামাকাপড়, কয়েক শত জোড়া জুতো, পুরোনো আসবাবপত্তর সব মিলে তিল ধরানোর জায়গা নেই।

বস্তু সভ্যতার অতি ভোগের সবচেয়ে বড় প্রমান মেলে বাড়ির বেসমেন্টে। যেমন ধরা যাক জ্যাকেট। এখানে বছরে পাঁচ থেকে আট মাস জ্যাকেট পরতে হয়। তার আবার কত রকমভেদ, শীতের ও বসন্তের, অল্প শীত ও বেশী শীত, পার্টিতে ও রেগুলার পরার জন্য, স্কুল বা অফিসে পরার জন্য। তারপর প্রত্যেক রকমের জন্য আবার কয়েকটা করে থাকা দরকার, কত প্রয়োজন আমাদের। পরি-না-পরি অন্য কথা। ব্যবহার হোক বা না হোক আমরা সব রাখতে চাই। রাখা আর থাকাতেই সুখ। আধুনিক বস্তুবাদি সভ্যতার এই অতিভোগ-প্রবনতাই যত অনিষ্টের মূল। বলা যেতে পারে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য হীনতার একটা অন্যতম কারন। হিসেবে দেখা যায় আমাদের সংগৃহীত ব্যবহারযোগ্য জিনিসের আশি শতাংশ আমরা ব্যবহার করি না, বা বড়জোর কুড়ি শতাংশ ব্যবহার করি। আর বাকি কুড়ি শতাংশ জিনিস ব্যবহার করে থাকি। তবে আশার বিষয় হল, মানুষ সজাগ হচ্ছে। সেয়ারিং ইকোনমির আয়তন বাড়ছে।

বেসমেন্টে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়েও কিছু উদ্ধার হল না। ফ্যামিলি রুমে ঐশী ও ঋতকে নিয়ে বসলাম। গুগল করতে পারলে উত্তর সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যেত কিন্তু তার উপায় নেই। ওয়াই-ফাই কাজ করছে না পাওয়ার নেই বলে। ঋত জিঞ্জেস করল, "তা বাড়িতে ওয়াটার ট্যাঙ্কের জল কিভাবে গরম হয়?" "জানিস না! গ্যাসে চলে। বাবা, দেখো না গ্যাসটার ফ্লেম হচ্ছে কিনা", ঐশী উত্তর দিল। ঠিক কথা, গ্যাস স্টোভে রান্না করতে গেলে ইলেকট্রিক সুইচ অন করতে হয় ওটা স্টার্ট করার সময়। সুইচ অন করলে একটা স্পার্ক হয়, আর ওটাতেই গ্যাস স্টোভ চালু হয়। সবেতেই বিদ্যুৎ! এখানে জীবনযাপন এত বিদ্যুৎ নির্ভর আগে কখনে উপলব্ধি করতে পারিনি। কিন্ত অনেক তো হল, এখনো বিদ্যুৎ আসছে না কেন? অটোয়া হাইড্রোকে ফোন করলাম। অটোমেটেড ম্যাসেজ আসছে। অটোয়ার হাজার হাজার বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই। পরিস্থিতির পর্যালোচনা চলছে। কখন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া যাবে তা অনিশ্চিত। তবু ফোনটা ধরে আছি, যদি সরাসরি কথা বলা যায়। যাঃ! কিছুক্ষনের মধ্যেই ফোনটা বন্ধ হয়ে গেল। অর্থাৎ আমাদের রজার্স টেলিফোন নেটওয়ার্কে যেটুকু ব্যাটারী ব্যাক-আপ ছিল সেটা শেষ। দিনের শেষে সেল ফোনেও চার্জ শেষ হয়ে এসেছে। চেষ্টা করে নেট ওয়ার্ক পাওয়া গেল না। হায় হায় একি দুরবস্থা! টিভি চলছে না। ঘরে একটা রেডিও নেই। এদেশে আসার পর প্রথম দিকে রেডিওর ব্যবহার হত সকালে ঘুম ভাঙানোর এ্যালার্ম ক্লকে। এখন আর দরকার হয় না, সেল ফোনেই সব হয়। এখন আমরা সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। তবু যাই হোক আমরা বিদ্ধস্ত এবং ক্লান্ত হলেও অক্ষত আছি। অটোয়ার অন্য বন্ধুরা কে কেমনভাবে আছে কে জানে। মনটা অস্থির হয়ে উঠল। অগত্যা গাড়িটা স্টার্ট করে রেডিওতে খবর শুনলাম।

খবরে জানা গেল অটোয়া-গ্যাটিনো এলাকায় উপর দিয়ে চল্লিশ মিনিটে ছয়-ছটি টরনেডো বয়ে গেছে। শতাধিক বাড়িঘর ধূলিস্যাৎ হয়েছে। তিনজন আহত তবে নন-লাইফ থ্রেটনিং ইনজুরি হয়েছে। হাজার হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বিদ্যুৎ বিহীন। ডাণরোবিন ও গ্যটিনোর কয়েকটি এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পুরানো দিনের বড় বড় গাছ শিকড়সহ উপড়ে গেছে। উপদ্রুত এলাকার মানুষের আশ্রয়ের জন্য নিকটবর্তী কমিউনিটি সেন্টার খুলে দেওয়া হয়েছ। অনুমান করতে পারলাম টরনেডো চলাকালীন আমরা আরলিংন্টনের একেবারে বর্ডারে ছিলাম। টরনেডোর দাপটে আর্লিংটন উডসে মাত্র দশ মিনিটেই বহু ঘরবাড়ির ছাদ উড়ে গেছে বা ধরাশায়ী হয়েছে। আফিস ছেড়ে সবাই তখনও বাড়ি ফিরতে পারেননি। ঐ তিন জন ছাড়া উপদ্রুত এলাকায় যাঁরা সেই সময়ে বাড়িতে ছিলেন তাঁরা বাড়ির বেসমেন্টে আশ্রয় নেওয়ায় তাঁদের শারীরিক ক্ষতি হয় নি। অনেক চেষ্টায় জানা গেল টরনেডোতে হাইড্রো অটোয়ায় একটা বড় ট্রান্সফর্মার ভেঙে গেছে। ওটা তাড়াতাড়ি ঠিক হওয়ার সম্ভবনা খুবই কম। হঠাৎ আমার সেল ফোনটা বেজে উঠল। বিশ্বজিৎ-দার ফোন, "তোমরা সবাই ঠিক আছো তো"। হ্যা, আমরা কোনোভাবে বেঁচে গেছি। আপনারা ঠিক আছেন তো? আর বাকিরা? "হ্যাঁ, এখন অবধি যা খবর পেয়েছি তাতে আমাদের চেনাশুনো সবাই ঠিক আছে। তোমাদের বারহ্যাভেনের খবর বল"। "কি করে বলব? আমার ল্যন্ড ফোন ডেড। সেল ফোনে সিগন্যাল ছিল না। এতক্ষনে আপনার প্রথম ফোন পেলাম।" কিছুটা আস্বস্ত হলাম যে ওদিকে অনেকের বাড়িতে পাওয়ার না থাকলেও সবাই ঠিক আছে। ফোনটা

রাখতেই সুবীরকে কল করলাম। পেয়েও গেলাম। সুবীর বলল, ওরা সবাই ঠিক আছে। ট্রাফিক সিগন্যাল না থাকায় বিলিংস ব্রীজ থেকে বাড়ি ফিরতে তিন ঘন্টা লেগেছে। অনেকে রাস্তার ধারে গাড়ি পার্ক করে হেঁটে বাড়ি ফিরছেন।

আলোর জন্য আর অপেক্ষা না করে এবার ডিনারের আয়োজন হল। ফ্রিজে যা খাবার ছিল তাই বের করা হল। কেউ কমপ্লেন করল না। তাড়াতাড়ি খেয়ে আবার ফ্যামিলি রুমে বসা হল। পর্দাটা সরিয়ে দিতে বাঁকা চাঁদের আলোয় ঘরটা একটু উজ্বল হল। ঐশী ও ঋত আমার দুপাশে শুয়েই পড়ল। হাসু ওর সেলফোনে অন্যান্যদের খবর নেওয়ায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে কই। আমি মায়ের কাছে শোনা সেই গল্পটা ওদের শোনাচ্ছি। জ্যোষ্ঠ্যি মাসের ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। মায়ের কাকা হাট থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। হাতে বাজারের থলে। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। পাবেন কি করে, জ্যৈষ্ঠ্যের কালো মেঘ সেদিনের চাঁদটাকে ঘিরে রেখেছে যে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর মাঝে মাঝে শিয়ালের "হোক্কা হুয়া, হোক্কা হুয়া" চিৎকার পরিবেশটাকে শিহরিত করে তুলছে। সামনে বেশ দূরে কেউ একটা লণ্ঠন হাতে এগিয়ে চলেছেন। ঐ আলোর পিছু পিছু উনি চলেছেন। এই বুঝি লোকটাকে ধরে ফেললেন। কিন্তু না লণ্ঠনটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। কোথায় গেল? খানিক বাদেই খালের বাঁকটা ঘুরতেই আবার সেই আলো দেখতে পেলেন। আবার সেই দিকে পথ চলা। কিন্তু পথ আর শেষ হয় না। এভাবেই গল্প চলতে থাকল গল্পের তালে, আর আমি মাঝে মাঝে দেখছিলাম ওরা তখনও জেগে কিনা ঠিক যেমনটি মা করতেন। কিছুক্ষন পরে দেখলাম ওরা দুজনই ঘুমিয়ে পড়েছে। তবে গল্পের শেষ তখনও হয়নি। বুজতেই পারছেন এটা আলেয়ার গল্প। সারারাত আলেয়ার পেছনে ঘুরে মায়ের কাকা যখন দিকভ্রান্ত ও ক্লান্ত, তখন দাদামশাই মাঠের মাঝে ওনাকে খুঁজে পান।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমারও চোখ ঢুলু ঢুলু। ভাবনা ও কল্পনার রাজ্যে তখন পাক খাচ্ছি। ফিরে যাচ্ছি পুরানো সেই দিনগুলোতে। জন্মস্থান ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দুরে এসেও দেখতে পাচ্ছি কাঁঠাল গাছের নিচে আমাদের পুরানোবাড়ির ছাদটি। ঐতো বাড়ির পাশেই শানবাঁধানো পুকুরটা। কি আশ্চর্য্য! সবই দেখতে পাচ্ছি। মনে পড়ে যাচ্ছে এমনই ঘুটঘুটে সন্ধ্যায় ঘরপালিয়ে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে খেজুর গাছের ভাঁড়ে পাকাটির নল চুবিয়ে রস খাওয়ার কথা। মনে পড়ে যাচ্ছে সেই খালপার, পূবের বিল, ইছামতী নদী আর গা ছম-ছমে আম বাগানের পাশ দিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার কথা। একসময়ে শিয়ালদা ফেরত ইছামতী প্যাসেঞ্জারের হুইসেল শুনতে পেলাম। তার পর আর কিছু মনে নেই।

****

নিজের কথা

বেণু নন্দী

ভাইওর আদেশ মত আমাকে শারদীয়া পূজাসংখ্যার জন্যে লিখতে হবে। কিন্তু কি লিখব জানিনা। অনেক কিছুই তো লেখার থাকে।

অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে আমাদের পাড়ায় – বিশেষ করে পাশের বাড়ির কেভিনের মা গত হয়েছেন। তাছাড়া সামনের বাড়িতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন – বেস লাইনের উপর একটা দুই কামরার কন্ডো কিনে সেখানে উঠে গেছেন। তার আগে ওনাদের বাড়ির যতসব জিনিসপত্র একেবারে বের করে দিয়েছিলেন – যে যার পছন্দমত তুলে নিয়ে চলে গেল। আমার খুব খারাপ লাগছিল। কতদিনের প্রতিবেশী আমরা – ওই ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দুজনেই আমাকে খুব সাহায্য করতেন বিভিন্ন ব্যাপারে। যাই হোক এখন অন্য একজন কিনে নিয়েছে ওই বাড়ি আর তাদের জিনিসপত্র ভরে নিচ্ছে। একদিক দিয়ে সেটা ভালই হলো।

আমার বাগানের গাছের ডাল থেকে নেবে এসে লুক্কিরা খুব ছোটাছুটি করে – আমার দেখতে বেশ লাগে। আবার মজা করে আমার ডেকে এসে খাবার খোঁজে। আমি কিন্তু ওদের আসকারা দিই না। কারণ একবার খাবার দিলেই বারবার আসবে খাবার পাবার জন্যে। আমার ডেকের ওপর একটা কাঁচের বাসনে কিছু ফুলগাছ পোঁতা ছিল। হঠাৎ সেটা মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে যায়। খুব কষ্ট হল কিন্তু কিছুই করার ছিলনা। এই

বুধবার মানে সেপ্টেম্বারের ৪ তারিখে ফ্র্যান নামে এক মহিলা আসবে। সে স্নানের পর আমার হাতপায়ে তেল মালিশ করে দেয় – আর আরামে প্রায় ঘুম এসে যায়। ও শীতের সময় ফ্লোরিডা চলে যায় আর আমিও ওর অভাব বুঝতে পারি সেই কয়েক মাস। কি আর করা! বুধবার সাপ্তাহিক জঞ্জাল নিয়ে যায় – রাজকে বলতে হবে পাশে কেটে রাখা ডালপালা বাইরে বার করার জন্য নয়তো পড়েই থাকবে ওই ভাবে।

আগামীকাল আবার আমার সাপ্তাহিক সাঁতারের জায়গায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে ওদের কতদিন প্রাকশীতকালীন ছুটি থাকবে। সেই মত আবার প্যারা ট্রান্সপোকে বলে দিতে হবে - না আসার জন্যে। যাই হোক এই পর্য্যন্তই আজ থাক। পরে আবার লেখার চেষ্টা করে লিখব, কেমন?

****

Bhoot Jolokia of my garden

Nirmal Kumar Sinha

One of my French-Canadian neighbour is an avid gardener. He has a vegetable garden that is comparable to the Mughal Flower Garden in Delhi, my original home town. We have become close friends for many decades and exchange plants with each other, especially the seedlings in early springs. However, most of the years, I am more in the receiver's end because he has access to a green house and the spring time in Ottawa is rather unpredictable. Moreover, he fortified his vegetable garden in such a way that wild rabbits and groundhogs cannot penetrate as they do freely in my garden. My garden is like a country-side Indo-Canadian jungle compared to my friend's well-organized beds of tomatoes, peppers, tubers, carrots, beans, etc. He loves to experiment with different types of plants – especially the peppers and tomatoes. One year, he asked me if I would like to try growing, "Boot Yaloka", a kind of very hot pepper. I couldn't figure out the name and asked him several times to repeat it. Suddenly, it dawned upon me that it could be the "Bhut or Bhoot Jalokia", one of the hottest chili peppers of the world, native to India's northeastern states of Assam, Manipur, Arunachalam and Nagaland. Actually, I came to know about this incredibly hot chilli pepper from an article published in National Geographic Magazine many years ago, but never seen it. Naturally I agreed to try growing this pepper and he gave me three plants. Eventually they grew up in my garden and were loaded with peppers. I kept a close eye on their growth history and recorded many features. Figure 1 shows four stages of growth and a cross-sectional view of a matured unit.

Figure 1. Four stages of growth (left) and cross-sectional view of a Bhut Jolokia, one of the most hot (if not hottest) peppers of the world, native to northeastern states of Assam, Arunachal, Manipur and Nagaland of India

****

One Day in Kyiv

Subha Basu Ray

There were fresh leaves on the horse chestnuts in Kyiv, when we visited in April. The pink and white blossoms appear later, only in May. The delicately scented blooms, which stand like candles on leafy branches, are a symbol of this ancient city, celebrated in music and poetry. We will have to wait for a second visit, before we are able to appreciate their legendary beauty.

Looking out of the window of our hotel room, as day was breaking in Kyiv, I could barely discern the canopy of the trees in Mariinsky Park. A thick fog shrouded the city. The drive in to Kyiv from Boryspil Airport, the night before, had been at break neck speed! Images rushed by my window: shards of light, stretches of darkness and the blurry outlines of buildings! We must have crossed the River Dnieper at some point, from the left bank to the right. I hardly noticed! It was a Saturday night, and Yuri, our driver, must have had plans.

The reception lounge of the Natsionalny Hotel was cavernous, bold and brassy, apparently favoured by civil servants. The Ukrainian Parliament building, the Verkhovna Rada, was just down the street. Except for one friendly young lady at the reception desk, the others spoke no English and seemed dour and distant. Luckily for us, Miss Congeniality was on duty when we checked in, the night before!

Complimentary breakfast at the Natsionalny was a la carte, which for me were pancakes bursting with blueberries, served with a generous dollop of sour cream. We then waited in the lounge for our guide, for a three-hour tour of the city. Being a Sunday, this was the only opportunity my husband had to see Kyiv, outside of office and hotel.

Our tour began, logically, on the bank of the Dnieper, at the monument of the legendary founders of Kyiv, the brothers Kyi, Shchek and Khoryv and their sister Lybid.

Statue of the three founders

Strategically located on an ancient trade route, the settlement grew to become the premier city of the Kievan Rus, a loosely confederated state of independent principalities, comprising of territories of present-day Belarus, Russia and Ukraine. Through its long, often turbulent history, Kyiv has been looted and sacked, ravaged by war and famine and yet has survived with amazing tenacity! Today, it is home to a population of more than two million, having spread to the west bank of the river, the old and the new reflected in its architecture and popular culture.

The Kyiv Pechersk Lavra, a UNESCO World Heritage site, has been a pre -eminent centre of Eastern Orthodox Christianity since its foundation in 1051. Commissioned by Antonite monks and built by architects from Constantinople, it has remained an active place of worship and pilgrimage through the centuries.

The Great Bell Tower of Lavra is one of the most recognisable landmarks of Kyiv's skyline. Standing at more than 95 metres, it was the tallest structure at the time of its construction in the 16th century. With four classical, colonnaded tiers and a gilded dome, it has both grace and beauty.

The Gate Church of the Trinity sits atop of one of the principal entrances of the Lavra. Originally built as a Kievan Rus church, it was later reconstructed in the baroque style of architecture. Beautiful frescoes depicting biblical scenes, decorate both the interior and exterior walls of the church.

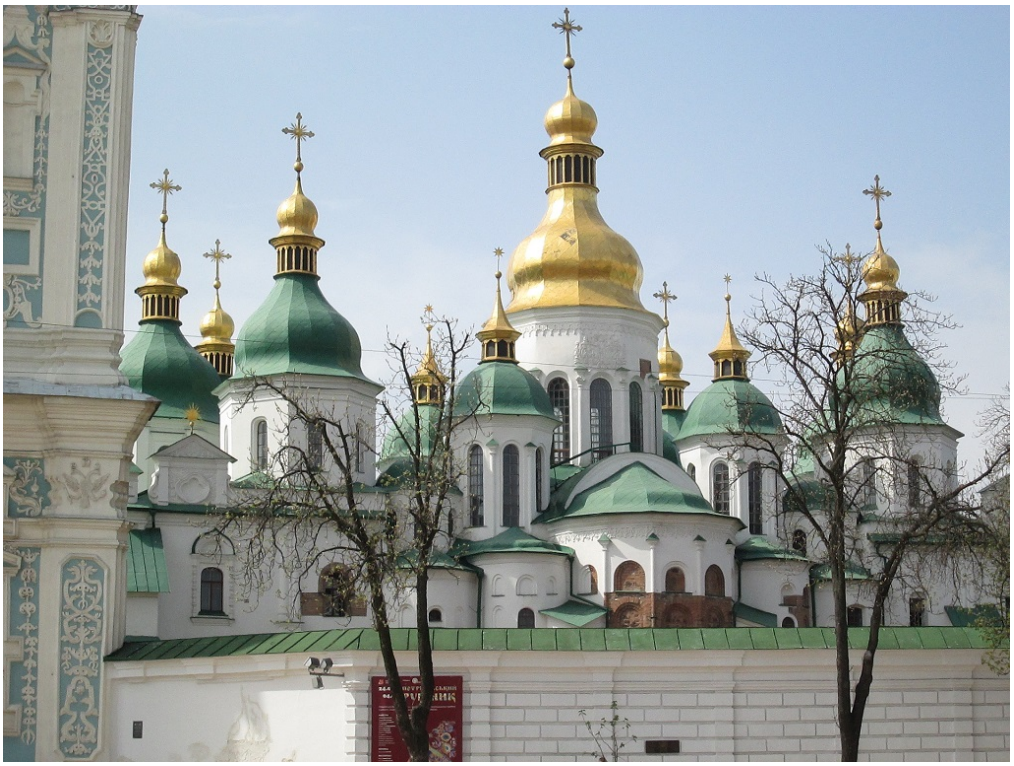

St. Sophia Cathedral

A tour of the entire complex would have taken half a day, time we did not have. After quick stops at the cathedrals of St Sophia and St VIadimir, the Maidan and St Andrew's Descent (the Montmarte of Kyiv), our tour was over. Through the course of the following week, I had the opportunity to revisit most of the sites at a far more leisurely pace, with Liudmila, my Viator guide.

The highlight of our first evening in Kyiv, was a superb performance of "Swan Lake" at the Ukrainian National Opera house. First established in the mid 19th century, it was rebuilt in an imposing, neo renaissance style in 1901. The interior is opulent, if somewhat jaded with time. It was here that Tsar Nicholas II and two of his daughters, the Grand Duchesses Olga and Tatiana, were attending a performance

in Sept 1911, when they witnessed the assignation of the prime minister, Pyotr Stolypin, by an alleged revolutionary.

“Swan Lake” was our first full length ballet. We were charmed by the evocative beauty of the sets, the artistry of the performers and the exquisite costumes. It was a sold-out show, including many children, some young enough to sit on their parents’ knees. Yet there was pin drop silence during the performance! Going to the opera, it appears, is no longer reserved for the well heeled, as it was in Imperial Russia!

Walking down the side streets near our hotel, looking for a restaurant open at that late hour after the performance, we found “Salon Du Vin”. Literally next door to our hotel, serving French wine paired with an eclectic selection of food, serenaded by vintage Edith Piaf, in an intimate environment lit by pillar candles! We went back to “Salon Du Vin” almost every night during our stay in Kyiv and were never disappointed.

Our last evening in Kyiv, was cold and blustery. We grudgingly wore our winter coats as we walked down to “Salon Du Vin” for the last time. Halfway through our meal, I turned to the candlelit window to see a face pressed against it. A heavyset, elderly woman, in a threadbare coat, clutching on to some bread in one hand, the other holding on to a bottle of whatever she was drinking, her expression quizzical, even reproachful. Or so I imagined. It filled me with a sense of unease and reminded me that all was not well for the proud people of this ancient land, that everyday living for ordinary citizens, especially pensioners, was a constant struggle.

I have wondered about Liudmila and her family, through the course of the years. At the time of our visit, her elderly father was straining to meet his expenses on a meagre pension. Her husband was unemployed and her son looking to leave for greener pastures in the West. I can only hope, that with a new government recently elected to office, there will be change for the better. Liudmila and her family deserve no less.

****

তাস খেলা

সুভাষ বিশ্বাস

ভারাক্রান্ত স্মৃতির বোঝা নিয়ে

চার বৃদ্ধ বয়স গণনা করে।

আনন্দময় পার্কে তারা রোজ বসে,

তাস খেলে আর সূর্যাস্ত দেখে।

কফির রঙ ক্রমশঃ কালো,

শূন্য দৃষ্টি, মাঝে মাঝে হাসির লহরা।

সূর্য্য ডোবে, পাশের সিনেমা হলে ভিড় জমে।

এবার ফেরার পালা।

আবার দেখা হবে।

চার বৃদ্ধ চার পথে যায়।

রাত্রি নামে, অন্ধকার ঘনায়।

আবার দিনের আলো, আবার দেখা।

কত গাড়ি, কত মানুষ, কত সিনেমা।

কত হর্তনের বিবি আর ইস্কাবনের সাহেব।

দিন আসবে, দিন যাবে,

ফুল ফুটবে, গাড়ি, মানুষ, সিনেমা হল।

আনন্দময় পার্ক।

আবার কি তাস খেলা হবে?

****

ইকবাল বানো এবং ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ

সুপর্ণা মজুমদার

আজ আপনাদের কাছে এমন একজনের কথা বলবো যাঁর জীবনে ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের প্রভাব বিশেষ ভাবে স্বীকার্য । তিনি হলেন বিখ্যাত গায়িকা ইকবাল বানো ।

তাঁর কথা বলতে গেলে কিছুটা পিছিয়ে যেতে হবে।

ইকবাল বানোর জন্ম রোহতাকে – বড় হয়েছেন দিল্লীতে । তালিম পেয়াছেন ওস্তাদ চাঁন্দ খান নামে একজন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পীর কাছে। ১৯৫২ সালে ১৭ বছর বয়েসে বিয়ের পরে তিনি পাকিস্তানে চলে যান । স্বামীর উৎসাহে তাঁর গান গাওয়াতে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি । ইকবাল বানো ছিলেন ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের লেখার ভক্ত । দুজনের মধ্যে খুব সুন্দর বন্ধুত্ব ছিলো ।

১৯৭৭ সালে জিয়া উল্ হক ক্ষমতায় এলে তিনি পাকিস্তানের মানুষের ওপর নানা ধরণের শরীয়তী নিয়ম লাগু করেছিলেন ।

"On 5 July 1977, General Zia-ul-Haq led a coup d'état. In the year or two before Zia-ul-Haq's coup, his predecessor, leftist Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto, had faced vigorous opposition which was united under the revivalist banner of *Nizam-e-Mustafa* ("Rule of the prophet"). According to supporters of the movement, establishing an Islamic state based on *sharia* law would mean a return to the justice and success of the early days of Islam when the Islamic prophet Muhammad ruled the Muslims. In an effort to stem the tide of street Islamisation, Bhutto had also called for it and banned the drinking and selling of wine by Muslims, nightclubs and horse racing.

On coming to power, Zia went much further than Bhutto, committing himself to enforcing *Nizam-e-Mustafa*, i.e. *sharia* law. Most accounts confirm that Zia came from a religious family and religion played an important part in molding his personality. His father worked as a civilian official in army headquarters and was known as "Maulvi" Akbar Ali due to his religious devotion."

(Wikipedia)

সেই সময় পাকিস্তানে ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের লেখা কবিতা পাঠ বা গান গাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো ।

প্রতিবাদ এলো ইকবাল বানোর কাছ থেকে। ১৯৮৫ সালে লাহোর স্টেডিয়ামে তাঁর গানের প্রোগ্রাম । ৫০ হাজারের মানুষ এসেছিলো তাঁর গান শুনতে । মঞ্চে এলেন কালো রঙ্গের সাড়ী পরে এবং প্রথমেই বললেন – আদাব, দেখুন আমি তো ফয়েজের গজল গাইবো, যদি আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তবে জেলের মধ্যেও আমি শাসক (হুকুমরান) দলকে ফয়েজের গান শোনাবো ।

সভাগৃহ নিস্তব্ধ হয়ে গেলো ।

ইকবাল বানো গান শুরু করলেন – "হম্ দেখেঙ্গে লাজিম হ্যায় কে হম্ দেখেঙ্গে

উও দিন কা জিস কে ওয়াদা হ্যায় "

Youtube এ ইকবাল বানোর এই গজল টি শুনতে পাবেন । Link টি এখানে দিলাম ।

https://www.youtube.com/watch?v=dxtgsq5oVy4

যখন গাইছেন -

"সব্ তাজ উছালে যায়েঙ্গে - সব্ তক্ত গিরায়ে যায়েঙ্গে " গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ।

ইকবাল কে শাস্তি পেতে হয়েছিলো বৈকি। তবে তাতে করে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গিয়েছিলো ।

https://www.theguardian.com/music/2009/may/11/iqbal-bano-obituary

ফয়েজের এই অনবদ্য কবিতাটির বাংলা অনুবাদ এখানে দিলাম । আশা রইলো আপনাদের ভালো লাগবে ।

হম্ দেখেঙ্গে

ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ

লাজিম হ্যায় কি হম্ ভি দেখেঙ্গে
উয়হ্ দিন কে জিসকা ওয়াদা হ্যায়,
যো লওহ-এ-অজল্ মে লিখা হ্যায়।

যব জুল্ম-ও-সিতম্ কে কোহ-এ-গরান
রুঈ কি তরহা উড়্ জায়েঙ্গে।

হম্ মহকুমোঁ কে পাঁও তলে
যব ধরতি ধক্ ধক্ ধড়কেগী,
অউর অহল্-এ-হুকম্ কে সর্ উপর
যব বিজলি কড়্ কড়্ কড়কেগী,

যব অরজ-এ-খুদা কে কাবে সে
সব্ বুত উঠায়ে জায়েঙ্গে।

এ তো নিশ্চিত যে আমরাও দেখবো
সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি লেখা রয়েছে
অনন্ত কালের ফলকে।

যখন নিষ্ঠুরতা ও নিপীড়নের অন্ধকার শিখর
পেঁজা তূলোর মতো উড়ে যাবে -

যখন আমাদের এই পরাধীন পায়ের তলে
এই ধরিত্রীর হৃদপিণ্ড ধক ধক করতে থাকবে -
আর যখন অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মাথার উপরে
বজ্র বিদ্যুৎ কড় কড় করে বাজবে।

যখন দেবতার আসন থেকে
সব সংস্কার সরিয়ে ফেলা হবে

হম্ অহল্-এ-সফা মরদুদ-এ-হরম

মসনদ্ পে বিঠায়ে যায়েঙ্গে।

সব্ তাজ উছালে যায়েঙ্গে

সব্ তক্ত গিরায়ে যায়েঙ্গে।

বস্ নাম রহেগা আল্লাহ্ কা ,

যো গায়েব ভি হ্যায়, হাজির ভি,

যো মন্জর ভি হ্যায়, নাজির ভি।

উঠেগা "অন্-অল্-হক্" কা নারা

যো ম্যঁয় ভি হুঁ , অউর তুম্ ভি হো,

অউর রাজ করেগি খল্ক-এ-খুদা

যো ম্যয় ভি হুঁ, অউর তুম ভি হো।

তখন আমরা যারা ক্ষমতাহীন,

যারা বিশ্বাস ধরে রেখে ছিলো

আবার তাদের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত করে যাবো

প্রতিটি মুকুট ছুঁড়ে ফেলে যাবো

প্রতিটি সিংহাসন ধূলায় লুটিয়ে যাবো

শুধুমাত্র ঈশ্বরের নাম থেকে যাবে

যে অদৃশ্য আবার দৃশ্যমান ও

যে নিজেই এক দৃশ্য এবং নিজেই এক দর্শক

যখন উঠবে "আমিই সত্য" এই জয়ধ্বনি

(যে সত্য আমি এবং যে সত্য তুমি)

আর রাজত্ব করবে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবেরা

যা আমি আর যা তুমিও।

**** শেষের দুটি অনুচ্ছেদ লক্ষ্য করে দেখুন, উপনিষদের বাণীর সঙ্গে কি অসাধারণ মিল ।**

Laugh and Live Longer (collected from anonymous sources)

- A Really Senior Driver

My neighbor was working in his yard when he was startled by a late model car that came crashing through his hedge and ended up in his front lawn.

He rushed to help an elderly lady driver out of the car and sat her down on a lawn chair. He said with excitement, "You appear quite elderly to be driving."

"Well, yes, I am," she replied proudly. "I'll be 97 next month, and I am now old enough, that I don't even need a driver's license anymore."

He asked "How do you know?"

"The last time I went to my doctor, he examined me and asked if I had a driver's license. I told him, yes and handed it to him."

He took scissors out of the drawer, cut the license into pieces, and threw them in the waste basket, saying, 'You won't need this anymore.'

So I thanked him and left!

A Student who got 0% Marks, was surprised because his all answers were seemingly correct! Read his answers and see if you agree…

Q.1 - In which battle did Tipu Sultan Die? Ans. - In his Last Battle.

Q.2 - Where was the Declaration of Independence Signed? Ans. - At the Bottom of the Page.

Q.3 - What is the Main Reason for Divorce? Ans. - Marriage.

Q.4 - Ganga Flows in which State? Ans. - Liquid State.

Q.5 - When was Mahatma Gandhi Born? Ans.- On His Birthday.

Q.6 - How will you Distribute 8 Mangoes among 6 People? Ans - By Preparing Mango Shake!!

Q.7 - India Me saal bhar Sabse Zyada Baraf Kaha Girti Hai...??? Awesome Reply By Student- "Daaru K Glass Me..."

টিকেট চেকার (ট্রেনে, সাধু রূপী যাত্রীকে)ঃ কোথায় যাবেন বাবাজী?
সাধুঃ শ্রী রামচন্দ্রের জন্মভূমিতে।
টিকেট চেকারঃ খুব ভাল। তা আপনার টিকেটটা একটু দেখান।
সাধুঃ টিকেট তো নেই আমার, এমনিই যাব পুণা ভূমিতে।
টিকেট চেকারঃ টিকেট নেই? তাহলে চলুন এবার আমার সাথে।।
সাধুঃ কোথায় যাব?
টিকেট চেকারঃ ওই যেখানে শ্রী কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল, সেইখানে - শ্রীঘরে। আর এক পুণ্যভূমিতে।

- দাম্পত্য সংলাপ

স্ত্রী: এই শোনো, ভাবছি চুলটা ছোট করে কেটে ফেলি। কি বল? স্বামী: কেটে ফেলো।

স্ত্রী: এত কষ্ট করে বড় করলাম... স্বামী: তাহলে কেটো না।

স্ত্রী: কিন্তু আজকাল ছোট চুলই তো ফ্যাশন! স্বামী: তাহলে কেটে ফেলো।

স্ত্রী: আমার বন্ধুরা বলে যে আমার যে মুখের কাটিং তাতে বড় চুলই মানায়।

স্বামী: তাহলে কেটো না।

স্ত্রী: কিন্তু ইচ্ছে তো করে। স্বামী: তাহলে কেটে ফেলো।

স্ত্রী: ছোট চুলে তো বিনুনি হবে না। স্বামী: তাহলে কেটো না।

স্ত্রী: ভাবছি এক্সপেরিমেন্ট করেই ফেলি, নাকি! স্বামী: তাহলে কেটে ফেলো।

স্ত্রী: বাজে করে কেটে দিলে? স্বামী: তাহলে কেটো না।

স্ত্রী: না। কেটেই দেখি না একবার। স্বামী: তাহলে কেটে ফেলো।

স্ত্রী: যদি আমাকে স্যুট না করে তাহলে কিন্তু তুমি দায়ী! স্বামী: তাহলে কেটো না।

স্ত্রী: আসলে ছোট চুল সামলাতে সুবিধা। স্বামী: তাহলে কেটে ফেলো।

স্ত্রী: ভয় করে, যদি খারাপ লাগে। স্বামী: তাহলে কেটো না।

স্ত্রী: না, একবার কেটেই দেখি। স্বামী: তাহলে কেটে ফেলো।

স্ত্রী: তাহলে কবে যাবে? স্বামী: তাহলে কেটো না।

স্ত্রী: আমি মায়ের কাছে যাবার কথা বলছি। স্বামী: তাহলে কেটে ফেলো!

স্ত্রী: কি সব বলছ আবোল তাবোল। শরীর খারাপ নাকি? স্বামী: তাহলে কেটো না!

স্বামী এখন পাগলা গারদে ভর্তি আছে, মাঝে মাঝেই হঠাৎ করে বলে ওঠে 'তাহলে কেটো না...তাহলে কেটে ফেলো! তাহলে কেটো না...তাহলে কেটে ফেলো!'

****

Thank you on behalf of Deshantari and LIPIKA team. Hopefully you have enjoyed the LIPIKA edition of 2019. We earnestly request you to try to contribute to the next year's edition of LIPIKA.

Responsible Innovation

Reeto Ghosh, Gr 10

This multicolor artwork depicts the need for responsible innovation through emerging scientific technologies (e.g. Artificial Intelligence or AI) in today's society. On the right side of my piece, we can see the main causes of our biggest problem to date- global warming. Leading from this, on the left, we can see some of the effects of our extensive use of natural resources. Along the bottom of this piece, we can see the protests and outcries for help, and a change in our lifestyle. The eye at the center of my artwork represents the vision for the responsible application of emerging scientific technologies to address our global issues, such as climate change. It also suggests that our new scientific breakthroughs and innovations are used ethically and for the best interest of our society.

Somudra-Soikat

Arna Nandi, 8 years